POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ
وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ؕ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا
عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
مِنْهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (المائدہ:74)

নিশ্চয় তাহারা কুফরী করিয়াছে যাহারা বলে, 'আল্লাহ্ তিনের মধ্যে তৃতীয়'; অথচ এক মা'বুদ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই। এবং তাহারা যাহা বলিতেছে উহা হইতে তাহারা যদি নিবৃত্ত না হয় তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহাদিগকে নিশ্চয় যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করিবে।

(আল মায়েদা: ৭৪)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 33

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

19 আগস্ট, 2021 ● 9 মহররম 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যথাস্থানে সম্পদ খরচ করার এবং অপরকে শেখানোর শ্রেষ্ঠত্ব ।

১৪০৯) হযরত ইবনে মাসউদ (রা.)–এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে; নবী (সা.) যখন আমাদেরকে সদকা করার আদেশ দিতেন, তখন আমাদের মধ্যে কেউ বাজারে গিয়ে সেখানে মুটের কাজ করে এক 'মুদ' অর্জন করত, আর এমন অবস্থা যে তাদের অনেকের কাছে এক লক্ষ করে (দিনার) আছে।

১৪১৭) হযরত আদ্দি বিন হাতিম (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে বলতে শুনেছি, 'আগুন থেকে রক্ষা পাও, এক টুকরো খেজুর দানের মাধ্যমে হলেও।

১৪১৮) হযরত আয়েশা (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা উপস্থিত হল, যার সাথে তার দুই মেয়ে ছিল।সে যাচনা করছিল। আমি নিজের কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই পেলাম না। আমি তাকে সেই খেজুরটি দিলাম। সেই মহিলা খেজুরটি তার দুই মেয়ের মধ্যে ভাগ করে দিল, নিজে খেল না। এরপর সে উঠে বাইরে চলে গেল। এরপর নবী (সা.) আমার কাছে এলে আমি তাঁকে সমস্ত ঘটনা শোনালাম। তিনি (স.) বললেন, 'যে এই মেয়েদের কারণে কোন কষ্টে নিপতিত হয়, তার জন্য এই মেয়েরা আগুনের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

(সহীহ বুখারী, ৩য় খণ্ড,কিতাবুয যাকাত, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৯ই জুলাই ,২০২১
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

খোদা তা'লার প্রত্যাদিষ্ট ও আওয়লিয়াদের বিরোধিতা এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পরিণাম কখনও ভাল হতে পারে না। যে ব্যক্তি মনে করে যে সে তার উপর অত্যাচার করে, তাকে কষ্ট দেওয়ার পরও সুখ লাভ করতে পারে, সে চরম বিভ্রান্তিতে আছে, সে আত্ম প্রবঞ্চনার শিকার।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

কেবল আরবীর অলঙ্কার ও পদবিন্যাস, কিম্বা যুক্তিশাস্ত্রে অপ্রতিম হওয়াকেই ধর্মশাস্ত্রে বিদ্বান হওয়া বোঝায় না, ধর্মশাস্ত্রে বিদ্বান বলতে সেই ব্যক্তিকে বোঝানো হয় যে সব সময় আল্লাহ্ তা'লাকে ভয় করে আর তার মুখে কুকথা উচ্চারিত না হয়। কিন্তু আজ এমন এক যুগ এসেছে যখন কিনা ডোমেরাও নিজেদেরকে পণ্ডিত বলে পরিচয় দিচ্ছে, তারাও উলেমা উপাধি ধারণ করেছে। এভাবে এই শব্দটি গুরুত্ব হারিয়ে জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। আর এখন খোদার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে এর অর্থ করা হয়। অন্যথায় কুরআন শরীফে উলেমাদের যে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে তা হল– اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا । অর্থাৎ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে উলেমা তারাই যারা আল্লাহ্‌কে ভয় করে। (আল ফাতির: ২৯) এখন আবশ্যিকভাবে দেখার বিষয় হল, যাদের মধ্যে খোদাভীতি, সশ্রদ্ধ ভয় নেই, আর যারা পুণ্যবান নয়, তারা কখনই এই উপাধি পাওয়ার যোগ্য নয়।

বস্তুত, 'উলেমা' শব্দটি আরবী 'আলেম' শব্দের বহুবচন। আর আরবীতে 'ইলম' বা জ্ঞান সেই বিষয়কে বোঝায় যা সুনিশ্চিত এবং নিরপেক্ষ; আর প্রকৃত জ্ঞান কুরআন করীম থেকে পাওয়া যায়, এটি গ্রীক কিম্বা ইংরেজদের প্রচলিত দর্শন থেকে পাওয়া যায় না। বরং এটি সত্যিকার ঈমানের দর্শন থেকে পাওয়া যায়। আর উলেমার মর্যাদায় উপনীত হয়ে নিশ্চিত জ্ঞান লাভের মর্যাদা লাভ করাই হল মোমেনের আধ্যাত্মিক উর্ধ্বভ্রমণ এবং পরাকাষ্ঠা, এটিই (আধ্যাত্মিক) জ্ঞান লাভের শিখর। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত ও নিশ্চিত জ্ঞান লাভ থেকে বঞ্চিত, মারেফাত এবং অন্তর্দৃষ্টির পথ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তারা নিজেদেরকে আলেম হিসেবে পরিচয় দিতেই পারে, কিন্তু জ্ঞানের বৈশিষ্ট থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। তাদের মধ্যে সেই জ্যোতি পাওয়া যায় না যা প্রকৃত জ্ঞান থেকে পাওয়া যায়। এমন ব্যক্তিরা খোলাখুলি ক্ষতি ও বঞ্চনার মধ্যে আছে। এরা নিজেদের পরকাল ধোঁয়া ও অন্ধকারে পূর্ণ করে ফেলে। তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ্ তা'লা বলেন–

مَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى (বনী ইসরাঈল: ৭৩) যে ব্যক্তি ইহকালে অন্ধ, সে পরকালেও অন্ধ হিসেবে উত্থিত হবে। যাকে ইহজগতে জ্ঞান, অন্তর্দৃষ্টি এবং মারেফাত (খোদার পরিচয়) দেওয়া হয় নি, সে পরকালে কিভাবে জ্ঞানলাভ করবে? আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার চোখ ইহজগত থেকেই নিয়ে যেতে হয়। যে ব্যক্তি ইহজগতে সেই চোখ তৈরী করে না, আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার প্রত্যাশা তার করা উচিত নয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড,পৃ: ৩১৭)

প্রধান বিষয়টি নিয়ে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হল এর পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষা। জনৈক ইহুদী বলেছিল, 'আপনাদের শরীয়তে একটি বিষয় দেখে আমি অভিভূত হই, জীবনের কোন অংশ এমন নেই যে বিষয়ে এটি আলোকপাত করে নি।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা হুজরাতের ২ নং আয়াত رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন–

কুফফারদের এই মনোবাসনা সম্পর্কে তফসীরকারকরা বিতর্ক করেছেন যে তারা কখন মুসলমান হওয়ার বাসনা করেছে? কিছু তফসীর কারক বাধ্য হয়ে বলেছেন, তারা সেই সময় এই বাসনা করবে, যখন মুসলমানদের বিজয় হয়েছে। কিছু তফসীরকারক কিয়ামতের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বলেছে, তারা সেই সময় বলবে, 'আমরা যদি মুসলমান হতাম! কিছু তফসীরকারক এটিকে ইসলামের উন্নতিকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ যখনই উন্নতি হবে তারা এই বাসনা করবে।

এই অর্থগুলিও সঠিক, কেউ এর উপর আপত্তি করতে পারবে না। কেননা শত্রুতা যখন অকারণে হয়, যেমন আরবের কাফেররা আঁ হযরত(সা.)–এর প্রতি শত্রুতার করত। কাজেই শত্রুর উন্নতি দেখে মানুষের প্রায়ই এমন মনে হয় যে, 'আমি যদি তার

এরপর ৮ এর পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

জামেয়ার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর ভাষণ

তাশাহুদ তাউয, তাসমিয়া এবং সুরা ফাতিহা পাঠের পর হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন:

জামেয়ার ব্যবস্থাপনার পক্ষ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে তাতে বিভিন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা রয়েছে। জামেয়ার পাঠক্রম ছাড়াও এই বিষয়গুলির সঙ্গে এজন্য পরিচয় করানো হয় বা এগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বলা হয় যাতে মুরুব্বীরা কর্মক্ষেত্রে আসার পর একদিকে যেমন সেই সব বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত থাকে তেমনি সেগুলির গুরুত্বও স্পষ্ট হয়ে যায় এবং এর উপর আমল করার চেষ্টাও করে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: কর্মক্ষেত্রে আপনাদের দায়িত্বাবলী বেড়ে যায়। যদিও জামেয়ায় শিক্ষার্জনকারী একজন ছাত্রের কাছে এই প্রত্যাশাই করা হয় যে, তার ধর্মীয়, নৈতিক ও চারিত্রিক মান এবং চাল-চলন, বাচনভঙ্গি ইত্যাদি অন্যদের থেকে পৃথক হবে এবং ক্রমশঃ সেই মান আরও উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আসার পর আপনাদের কাঁধে বিরাট বড় দায়িত্ব এসে পড়ে। এখন আপনারা আর ছাত্র নন। যদিও মানুষ সারা জীবন ছাত্রই থাকে। (মানুষের শেখার অন্ত নেই) আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অর্জন করা উচিত। আপনাদের এও দায়িত্ব যে, একদিকে যেমন আহমদীদের তরবীয়ত করবেন অপরদিকে অ-মুসলিমদেরকে ইসলামের অপূর্ব সুন্দর শিক্ষার বাণী পৌঁছে দিবেন। এটি একটি বিরাট দায়িত্ব।

তিনি বলেন: যে নযম পড়া হয়েছে সেখানে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) একথাই বলেছেন যে, একটি উদ্দেশ্য অর্জন করতে হবে যা বিরাট দায়িত্বের কাজ। অতএব আপনাদের মধ্যে সব সময় এই দায়িত্ববোধের চেতনা থাকুক এবং ক্রমশঃ এক্ষেত্রে উন্নতি করুন। আহমদী হোক বা অ-আহমদী বা অ-মুসলিম, এখন পৃথিবীর দৃষ্টি আপনাদের উপর পড়বে। আপনাদের মন থেকে সকল প্রকার ভীতি দূর হয়ে যাওয়া উচিত এবং জগতের ভয় দূর করে আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রতিনিয়ত সম্পর্ক উন্নত করার চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ ত'লার সঙ্গে সম্পর্ক সর্বত্র আপনাদের কাজে আসবে। একজন মুরুব্বী বা মুবাল্লিগ যে যে ধর্মের বাণী পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করার এবং নিজের চারিত্রিক ও নৈতিক সংশোধনের পাশাপাশি পৃথিবীবাসীর সংশোধন করে তাদেরকে খোদার নৈকট্য অর্জনকারী করে তোলার অঙ্গীকার করে, খোদা তা'লার সঙ্গে তার সম্পর্ক তদনুরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

অতএব একথা সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোদা তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হয়, এই কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। সম্পর্ক তৈরী করার জন্য নফল নামায এবং ফরয নামাযের প্রতি অবহেলা ত্যাগ করতে হবে, বরং একাগ্রতার সাথে এদিকে মনোযোগ দিতে হবে। এটি চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জন করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি লক্ষ্য করেছি যে, আমি যখনই প্রশ্ন করি দেখা গেছে যে অধিকাংশ মুরুব্বীদের মধ্যে নফলের বিষয়ে খুবই অলসতা রয়েছে। তাহাজ্জুদে ওঠার ক্ষেত্রে তারা খুবই অলসতা করে। এখানে বিশেষত ইউরোপে গ্রীষ্মকালে রাত ছোট এবং দিন বড় হয়ে থাকে। খুব কম সময় পাওয়া যায়। কিন্তু এরই মধ্যে আপনাদের নফল পড়ার জন্য ঘুম থেকে ওঠা উচিত। এই নফল নামাযই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে এবং সম্পর্কেরে উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ফরয নামায তো প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এবং এটি আহমদী মুসলমানদের জন্য বিশেষভাবে আবশ্যক যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে গ্রহণ করেছে এবং ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। কিন্তু একজন মুরুব্বীর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এর থেকে অনেকাংশে বেশি। অতএব স্মরণ রাখবেন, নফল নামায আদায়ের প্রতি যেন আপনাদের দৃষ্টি থাকে। আবার অনেকে কর্মক্ষেত্রে আসার পরও ফজরের নামাযে অলসতা দেখায়। এই অলসতা এখন দূর করতে হবে। অলসতা দূর হলে তবেই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কে উন্নতি ঘটবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই যুগে এই উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন যেন তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ্‌র সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয়। এটি একটি মহান উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল মানুষের পরস্পরের অধিকারসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া। যদি অন্তরে খোদাভীতি থাকে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক থাকে, তবেই আপনি তৌহিদ প্রতিষ্ঠার জন্য যর্থাথভাবে চেষ্টা করতে পারবেন এবং তৌহিদ সম্পর্কে আপনাদের মধ্যে প্রকৃত জ্ঞানের উন্মেষ ঘটবে। অন্যথায় যদি ইবাদত না থাকে, বরং এর পরিবর্তে বিভিন্ন ধরণের অলসতা বাধা হয়ে দাঁড়ায়, তবে এর অর্থ হল আপনারা তৌহিদ বা একত্ববাদের পরিবর্তে অন্য কোন বিষয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমি প্রায়ই জামাতের সদস্যদেরকেও একথা বলে থাকি, কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করলে তবেই আপনারা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করতে পারবেন। ইবদাত ছাড়া আপনাদের জন্য একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর ইবাদত এবং নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়ার পর কুরআন করীম পড়া এবং গভীর অধ্যায়ন করা, তফসীর পড়া বিশেষ গুরুত্বের দাবী রাখে। জামেয়া আহমদীয়ায় আপনাদেরকে তফসীর পড়ানো হয়েছে এবং তফসীরের সংক্ষিপ্ত পরিচয় করানো হয়েছে। বা বলা যেতে পারে হয়তো কিছুটা তফসীর পড়ানো হয়েছে। কিন্তু এখন এক্ষেত্রে ব্যপকতা সৃষ্টি করতে এবং নিজেদের জ্ঞানভান্ডার আরও সমৃদ্ধ করতে একদিকে আপনাদেরকে নিজেকে কুরআন করীম গভীর মনোযোগের সাথে পড়তে হবে, অপরদিকে আরও অন্যান্য তফসীরও পড়তে হবে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর লেখনীতে বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, সেগুলি তফসীর আকারে একত্রিত করা হয়েছে। এই তফসীর নিয়মিত অধ্যায়নে রাখা উচিত। অনুরূপভাবে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখা প্রায় ৫৪ টি সূরার তফসীর রয়েছে, সেগুলি পড়া উচিত এবং নিজেদের অধ্যায়নের ব্যপকতা বৃদ্ধি করুন। এই বিষয়গুলিই ধর্মের ক্ষেত্রে আপনাদের কাজে আসবে। সব সময় চেষ্টা করবেন যে কোন প্রশ্নের উত্তর কুরআন শরীফ থেকে দেওয়ার। আর এটি তখনই সম্ভব যখন আপনাদের মধ্যে এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আমি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তফসীরের বিষয়ে সংক্ষেপে বলেছি যেটি চারটি খণ্ডে তফসীর আকারে জামাতের প্রকাশনার অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা অধ্যায়ন করাও অত্যন্ত জরুরী। প্রত্যহ অন্ততঃপক্ষে আধ-ঘন্টা সময় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কোন না কোন পুস্তক পড়া উচিত, এর থেকে বেশি সময় দিলে আরও উত্তম। এটি আপনার জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। অন্যথায় সাধারণ জাগতিক শিক্ষা আপনাদের কোন উপকারে আসবে না যা আপনারা বিভিন্ন জায়গায় শিখে এসেছেন, বা ভবিষ্যতেও হয়তো সে বিষয়ে আপনারা পড়ার সুযোগ পেতে পারেন। আপনারা মানুষকে যুগের মসীহর পুস্তকাদি পড়ান জন্য আহ্বান করে থাকেন, কিন্তু আপনারা নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত না পড়বেন, আপনাদের এই আহ্বান করা ফলপ্রসু হবে না। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে অধ্যায়ন অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তিনি বলেন: আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আপনারা কর্মক্ষেত্রে যুগ খলীফার প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন। অতএব সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তরবীয়ত এবং তবলীগ উভয়ই এর অন্তর্গত। প্রত্যেকটি কথা উচিত বলে মেনে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। এখানে আপনাদের সামনে নযমের একটি পঙক্তি লাগানো রয়েছে:

রুয়ে যমীন কো খোয়া হিলানা পড়ে হামেঁ। অর্থাৎ সত্য প্রকাশের জন্য প্রয়োজনে পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিতেও আমরা পিছপা হব না। আমি অনেক সময় দেখেছি, পৃথিবী কাঁপানো তো দূরের কথা, অনেকে তো সংবাদ মাধ্যম বা সমাজের সামান্য চাপে নতি স্বীকার করে নেই। বা স্বাধীনতার নামে প্রণয়ন করা সেই সব দেশের অনুচিত আইন-কানুনের প্রভাবে বুদ্ধিমত্তার পরিবর্তে তাদের কথা মেনে নিয়ে চুপ করে যায়। আমরা পৃথিবী তখনই কাঁপাতে পারব যখন আমাদের ঈমান সুদৃঢ় হবে এবং এই দৃঢ় ঈমানে নিয়ে পৃথিবীর সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হব। কুরআন করীম যদি সমকামিতাকে এক প্রকার নোঙরামি বলে থাকে, তবে পৃথিবীর যত সব আইন তৈরী হোক না কেন এর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। যদি ইসলাম ঘোষণা দেয় যে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি বিভাজন বা পার্থক্য রয়েছে এবং এই পার্থক্য থাকা উচিত, উভয়ের পরস্পর করমর্দন করা থেকে বিরত থাকা উচিত, তবে এই বিষয়টিকে আপনাদেরকে সাহসিকতার সাথে তুলে ধরতে হবে। এছাড়াও অন্যান্য অধিকারসমূহ রয়েছে। স্বাধীনতার নামে যদি এরা পথভ্রষ্ট হতে থাকে তবে বিচক্ষণতার নামে তাদের যুক্তি মেনে নেওয়ার পরিবর্তে এর থেকে তাদেরকে উদ্ধারের জন্য আপনাদেরকে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে হবে। মীমাংসা এবং সম্মতি জানানোর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। বিচক্ষণতা হল অবিচলভাবে কোন বিষয়কে প্রজ্ঞাপূর্ণ পন্থায় বর্ণনা করা। অর্থাৎ কোন কথা বলে ফেলার পর দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেলে নিজের কথা ফিরিয়ে নিয়ে তার কাছে নতি স্বীকার যেন না করা হয়। বা সেই কথার এমন ব্যাখা উপস্থাপন করতে আরম্ভ না করেন যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। এটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। হ্যাঁ যদি লড়াই হওয়ার আশঙ্কা দেখা

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

হযরত উমর (রা.) বলতেন, 'আমি নিজের সেনাবাহিনী প্রস্তুত করি, এমতাবস্থায় যখন আমি নামাযে থাকি।'

হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফত কাল প্রায় সাড়ে ১২ বছর কাল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের মোট আয়তন দাঁড়ায় বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। "

নামারিক ও কাসকার-এর যুদ্ধ, সাকাতিয়ার ঘটনা, বারুসিমার যুদ্ধ এবং জিসরের যুদ্ধের ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

চারজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করা হয় ও জানাযা গায়েব পড়ানো হয়, তারা হলেন- মাননীয় ফাতহী আব্দুস সালাম মুবারক সাহেব, মাননীয়া রাজিয়া বেগম সাহেব (কানাডার সাবেক মুবাল্লিগ ইনচার্জ খলীল আহমদ মুবাশ্বির সাহেবের সহধর্মিণী) , মাননীয়া সায়েরা সুলতান সাহেবা এবং মাননীয়া গাসসুন আল মুয়াজ্জানি সাহেবা)

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ১৬ জুলাই, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৬ ওয়াফা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। সে যুগে যেসব যুদ্ধ হয়েছে আর যেসব বিজয় অর্জি ত হয়েছেসে সম্পর্কে লেখা আছে (এটি ত্রয়োদশ হিজরী থেকে ত্রয়োবিংশ হিজরীর ইতিহাস) হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল প্রায় সাড়ে দশ বছর বিস্তৃত ছিল। সে যুগে অর্জিত বিভিন্ন বিজয়ের ব্যাপকতার উল্লেখ করতে গিয়ে আল্লামা শিবলী নোমানী তার গ্রন্থে লিখেছেন, হযরত উমর (রা.) কর্তৃক বিজিত অঞ্চলের মোট আয়তন দাঁড়ায় বাইশ লক্ষ একান্ন হাজার ত্রিশ বর্গমাইল। এসব বিজিত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলো হলো, সিরিয়া, মিশর, ইরান ও ইরাক, কুর্দিস্তান, আরমেনিয়া, আযারবাইজান, পারস্য, কিরমান, খুরাসান ও মাকরান যার মধ্যে বেলুচিস্তানেরও কিছু অংশ অন্তর্ভুক্ত।

(আল ফারুক, পৃ: ১৫৯, প্রকাশনা: ইদারাহ ইসলামিয়াত, ২০০৪)

ইসলামী যুদ্ধ এবং বিজয়ের ধারা তো হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে সিরিয়া এবং ইরাকে ইসলামী সেনাদল জিহাদে রত ছিল আর একই সময়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ চলছিল, এরপর এই ধারা চলমান থাকে এবং হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালেও একইভাবে অব্যাহত থাকে। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে একটি বিষয়, যা বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয় তা হলো, হযরত উমর (রা.) তাঁর সকল প্রকার ব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রতিটি বিজয়ের সময় মুসলমান সেনাদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন। যদিও তিনি তাঁর খিলাফতকালে কোন যুদ্ধেই রীতিমতো অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সৈন্যদের বিষয়ে মুসলমান সেনাপতিদের সকল নির্দেশনা তিনি মদিনা থেকেই প্রেরণ করতেন অথবা তিনি যেখানেই অবস্থান করতেন সেখান থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। বরং কোন কোন যুদ্ধের বৃত্তান্ত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলমান সেনাপতিদের সাথে প্রতিদিন হযরত উমর (রা.)-এর চিঠিপত্র আদান-প্রদান হতো আর হযরত উমর (রা.) মদিনায় বসে মুসলমান সেনাদের সুশৃঙ্খল বা সুবিন্যস্ত করার নির্দেশ দিতেন এবং তাদেরকে সেসব অঞ্চল সম্পর্কে এমনভাবে বলতেন বা নির্দেশনা প্রদান করতেন যেন হযরত উমর (রা.)-এর সামনে সেসব অঞ্চলের মানচিত্র ছিল বা সেসব অঞ্চল হযরত উমর (রা.)-এর নখদর্পনে ছিল। ইমাম বুখারী (রহ.) সহীহ্ বুখারীতে হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে লিখেছেন, وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِنِّيْ لَأُجَهِّزُ جَيْشِيْ وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ - (উচ্চারণ: ওয়া ক্বালা উমারু রাযিআল্লাহু আনহু ইন্নি লাউজাহিযু জেয়শী ওয়া আনা ফীস্ সালাত),

(সহীহুল বুখারী, কিতাবুল আমল ফিসসালাত)

অর্থাৎ হযরত উমর (রা.) বলতেন, আমি নামাযরত অবস্থায় আমার সেনাদল বিন্যস্ত করি। অর্থাৎ তিনি এত বেশি চিন্তিত থাকতেন যে, নামাযের সময়ও ইসলামী সেনাবাহিনী-সংক্রান্ত পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কাজ জারী থাকত আর সে সময় হয়ত দোয়াও করে থাকবেন। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখতে পাই, তাঁর নির্দেশ অনুসরণে মুসলমান সেনাবাহিনী কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লার দয়া ও অনুগ্রহে বিজয় অর্জন করেছে।

সৈয়দ মীর মাহমুদ আহমদ সাহেবও হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকাল সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সেখান থেকেও আমাদের নোট প্রস্তুতকারী রিসার্চ সেল কোন কোন নোট গ্রহণ করেছে। যাহোক মূল উৎসও চেক করা হয়েছে, (এবং তা) ঠিক আছে। ইরান ও ইরাকের বিজয় সম্পর্কে তিনি লিখেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর যুগে পারস্যবাসী বা ইরানীদের সাথে যুদ্ধ চলাকালে হযরত আবু বকর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন, যে কারণে ইসলামী সেনাদলের বিভিন্ন বার্তা পেতে বিলম্ব হচ্ছিল। এ কারণে হযরত মুসান্না ইসলামী সেনাবাহিনীতে নিজের স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে স্বয়ং হযরত আবু বকর (রা.) -এর সমীপে উপস্থিত হন যেন তাঁকে যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবগত করা এবং আরো সাহায্যের অনুরোধ করা যায়। হযরত মুসান্না মদিনায় পৌঁছে হযরত আবু বকর (রা.)-কে ঘটনাবলী অবহিত করেন, তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত উমরকে ডাকেন এবং এই ওসীয়্যত করেন যে, হে উমর! আমি যা কিছু বলছি তা মনোযোগ দিয়ে শোন এবং সে অনুসারে কাজ কর। আজ সোমবার। আমার মনে হচ্ছে আমি আজই মৃত্যুবরণ করব [এটি হযরত আবু বকর (রা.)বলছেন]। আমি যদি মারা যাই তাহলে সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই মানুষকে জিহাদের জন্য উদ্বুদ্ধ করে মুসান্নার সাথে প্রেরণ করবে আর আমার মৃত্যু যদি রাত পর্যন্ত বিলম্বিত হয় তাহলে সকাল হওয়ার পূর্বেই মুসলমানদের একত্রিত করে মুসান্নার সাথে পাঠিয়ে দিও। আমার মৃত্যুর বিপদ যত বড়-ই হোক না কেন তা যেন তোমাকে ধর্মের নির্দেশ এবং খোদা তা'লার নির্দেশ পালন থেকে কোনভাবেই বিরত না রাখে। তুমি দেখেছ যে, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর সময় আমি কী করেছিলাম। অথচ মানুষ এবং অন্যান্য সৃষ্টি এমন বিপদের কখনো সম্মুখীন হয় নি। খোদার কসম! আমি যদি তখন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ পালনে সামান্য বিলম্ব করতাম তাহলে খোদা তা'লা আমাদের লাঞ্ছিত করতেন, আমাদের শাস্তি দিতেন আর মদিনায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্বলে উঠতো। অতএব হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর(রা.) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হতেই এই ওসীয়্যত বাস্তবায়নে হযরত আবু বকর (রা.)কে দাফন করার পরবর্তী দিনই মানুষকে একত্রিত করেন। খিলাফতের বয়আত করার জন্য সকল দিক থেকে অসংখ্য মানুষ এসেছিল এবং তিন দিন পর্যন্ত তাদের লাইন লেগে থাকে। হযরত উমর (রা.) এই সুযোগকে আশীর্বাদ মনে করেন আর গণজমায়েতের সামনে জিহাদে উদ্বুদ্ধ করেন, কেননা আরবরা প্রাচীনকাল থেকেই ইরানের জাঁকজমক এবং অসাধারণ সামরিক শক্তিকে ভয় পেত আর মানুষের মোটের ওপর ধারণা এটিই ছিল যে, ইরাক হলো পারস্য

সাম্রাজ্যের রাজধানী আর তা হযরত খালেদ (রা.) ব্যতিরেকে জয় করা সম্ভব নয়, তাই সবাই নিশ্চুপ থাকে। হযরত উমর (রা.) কয়েক দিন পর্যন্ত নসীহত করেন, কিন্তু কোন প্রভাব পড়ে নি। অবশেষে চতুর্থ দিন তিনি এমন আবেগঘন বক্তৃতা করেন যে, উপস্থিত জনগণের হৃদয় কেঁপে ওঠে আর মানুষের উচ্ছসিত ঈমানী চেতনা সামনে আসে এবং হযরত আবু উবায়েদ বিন মাসুদ সাকফী (রা.) অগ্রসর হন আর 'আনা লে হাযা' অর্থাৎ 'আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি'– এই নারা উচ্চকিত করেন এবং উক্ত জিহাদের জন্য নিজের নাম উপস্থাপন করেন। তার পর হযরত সা'দ বিন রবি (রা.) এবং সালীদ বিন কায়েস (রা.) এগিয়ে আসেন। তাদের সামনে আসতেই মুসলমানদের হৃদয়ে ঈমানী উচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হয় আর তারা একান্ত উদ্দীপনার সাথে এগিয়ে এসে ইরাকের জিহাদের জন্য নিজেদের নাম উপস্থাপন করতে থাকে। পূর্বে ইরাকী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.)–এর হাতে ছিল, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) নিজের শেষ দিনগুলোতে সিরীয় যুদ্ধসমূহের গুরুত্বের প্রেক্ষিতে তাকে সিরিয়ায় যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর তখন ইরাকের ইসলামী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন হযরত মুসান্না বিন হারেসা (রা.)। হযরত উমর (রা.) যখন মুসলমানদেরকে ইরাকের যুদ্ধের জন্য নিজেদের নাম উপস্থাপন করার আহ্বান জানাচ্ছিলেন তখন হযরত মুসান্না (রা.)ও মদিনায় অবস্থান করছিলেন। তিনিও একটি প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা করেন এবং বলেন, হে লোকসকল! এই রণাঙ্গনকে অনেক কঠিন ও ভারি মনে করো না। আমরা পারস্যবাসীর সাথে যুদ্ধ করেছি এবং জয় লাভ করেছি। আর ইনশাআল্লাহ্ এর পরও বিজয় আমাদেরই হবে। মদিনা ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো থেকে ইরাকী যুদ্ধসমূহে অংশগ্রহণের জন্য মুজাহিদদের সমন্বয়ে বাহিনী গঠিত হয়, অর্থাৎ এই সমস্ত বক্তৃতা শোনার পর। তাবারী ও বালাদেরি এই বাহিনীর সংখ্যা এক হাজার উল্লেখ করেছেন। আর 'আখবারুত্ তিওয়াল' পুস্তকের লেখক আল্লামা আবু হানিফা দেনাভরি উক্ত সংখ্যা পাঁচ হাজার উল্লেখ করেছেন। সম্ভবত মদিনা থেকে যাত্রা করার সময় সংখ্যা এই বাহিনীর এক হাজার ছিল, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছা পর্যন্ত উক্ত সংখ্যা পাঁচ হাজারে উপনীত হয়, কেননা বালাদেরি ও আবু হানিফা ব্যাখ্যা করেছেন যে, বাহিনীর আমীর পথে যেসব আরব গোত্রের পাশ দিয়ে যান তাদেরকে বাহিনীতে যোগ দেয়ার জন্য আহ্বান জানান। এরপর এই প্রশ্নও ওঠে যে, এই সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান কে হবে? অর্থাৎ যদিও সেনাপ্রধান ছিলেন হযরত মুসান্না (রা.), কিন্তু নবগঠিত সেনাবাহিনীর সেনাপ্রধান কে হবে? হযরত উমর (রা.) বিচক্ষণ দৃষ্টি আবু উবায়েদ সাকফী (রা.)কে নির্বাচন করে। কারো কারো কাছে বিষয়টি অপছন্দনীয় ছিল যে, 'সাবেকূনাল আউয়ালূনা' তথা প্রাথমিক পর্যায়ের মুহাজের ও আনসার, যারা নিজেদের রক্ত দিয়ে ইসলাম নামক চারাগাছে জলসিঞ্চন করেছেন তাদেরকে উপেক্ষা করে এমন একজনকে আমীর বা সেনাপ্রধান নির্বাচন করা হয়েছে যিনি পরবর্তী যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, সাহাবীদের কোন স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যদি থেকে থাকে তবে তা কেবল এজন্য যে, তাঁরা (রা.) ইসলামের সেবায় অগ্রগামী ছিলেন আর ধর্মের প্রতিরক্ষায় অগ্রগামী হয়ে শত্রুর সাথে লড়াই করেছেন, কিন্তু এই ক্ষণে পিছনে থেকে তাঁরা নিজেদের সেই অধিকার হারিয়েছেন। তাইএই পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ইসলামের সুরক্ষার জন্য সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছে সে–ই নেতৃত্বের অধিকার রাখে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.)–এর পর সা'দ বিন উবায়েদ এবং সালীদ বিন কায়েস ইরাকের যুদ্ধের জন্য হযরত উমর (রা.)–এর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তাঁদের উভয়কে সম্বোধন করে বলেন, যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রগামী থাকতে তাহলে ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামী হওয়ার কারণে আমি নেতৃত্বের এই দায়িত্ব তোমাদেরকেই দিতাম; যদিও সালীদ বিন কায়েসের ওপর আবু উবায়েদকে অগ্রাধিকার প্রদানের পেছনে উল্লিখিত প্রথম কারণটি ছাড়া হযরত উমর (রা.) এটিও বলেন যে, এই কাজটির জন্য একজন ধীর–স্থির প্রকৃতির মানুষের প্রয়োজন যে ধৈর্য–স্থৈর্য প্রদর্শন ও চিন্তাভাবনা করে যুদ্ধ পরিচালনা করবে, কিন্তু সালীদ বিন কায়েস রণাঙ্গনে আক্রমণ রচনায় অত্যন্ত ত্বরাপরায়ণ প্রমাণিত হয়েছেন। হযরত উমর (রা.) যদিও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে আবু উবায়েদকে এই গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্বের ভার অর্পণ করেছিলেন কিন্তু মহানবী (সা.)–এর প্রবীন সাহাবীদের অতীতের অবদান বিগত দিনের অভিজ্ঞতাকেও উপেক্ষা করা সমীচীন ছিল না; তাই তিনি (রা.) হযরত উবায়েদ সাকফীকে জোর তাগিদও প্রদান করেছিলেন যে, তিনি যেন সাহাবীদের পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং ব্যবস্থাপনাগত বিষয়ে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী চলেন। তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে এই পুরো ঘটনাটি রয়েছে, যেখান থেকে এই উদ্বৃতিটি নেওয়া হয়েছে।

(তারিখে ইসলাম, বে আহদে হযরত উমর (রা.), নিবন্ধকার: সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৭–৯) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: দ্বিতীয় ভাগ, পৃ: ১৯৪) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৩৪,৩৬০–৩৬১) (আখবারুত তোয়াল, প্রণেতা–আবু হানিফা দেনোরী, পৃ: ১৬৫–১৬৬) (ফুতুহুল বালদান, পৃ: ৩৫০) (সীরাত আমীরুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা–আসসালাবি, পৃ: ৩৫৩) (আল ফারুক, প্রণেতা– শিবলি নুমানী, পৃ: ৭৮,৭৯)

হিজরী ১৩সনে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয় যা নামারিক ও কাসকার–এর যুদ্ধ নামে অভিহিত। হযরত আবু উবায়েদ সেনাবাহিনী নিয়ে যাত্রা করার পূর্বেই হযরত মু সান্না (রা.) হীরা নগরীতে গমন করেন, হীরা নগরী ছিল ইরাকের প্রাচীন আরব রাজত্বের রাজধানী। এটি ফোরাৎ নদীর পশ্চিম তীরে সেই স্থানে অবস্থিত ছিল যেখানে পরবর্তীতে কুফা নগরী গড়ে উঠে। তিনি রীতিমতো নিজ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, কিন্তু অনতিকাল পরেই এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, হযরত মুসান্না (রা.)–কে তাঁর গোটা সেনাবাহিনীসহ পিছু হটতে হয়। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো– ইরানী রাজদরবারে নেতৃস্থানীয় ও আমীরদের পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল। (সেখানে) নতুন এক শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে যে ছিল খুরাসানের গভর্ণর ফররুখ যাযের পুত্র রুস্তম। ইরানী রাজদবারের পক্ষ থেকে রুস্তমকে সবার নেতৃত্বের আসনে বসানো হয় আর সাম্রাজ্যের সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, যারা মতানৈক্য ও বিভেদের কারণে রাজ্যের শক্তিকে দুর্বল করার কারণে পরিণত হয়েছিল তারা এখন রুস্তমের আনুগত্য করতে থাকে। রুস্তম একজন বীর ও কুশলী ব্যক্তি ছিল। সে নেতৃত্ব গ্রহণ করা মাত্রই মুসলমানদের বিজিত এলাকায় তার কর্মকর্তাদের পাঠিয়ে বিদ্রোহ সৃষ্টি করে এবং ফোরাৎ সংলগ্ন জেলাসমূহে মুসলমানদের বিরুদ্ধে জনগণকে চরমভাবে উত্তেজিত করে এবং হযরত মুসান্নার মোকাবিলা করার জন্য একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এই অবস্থাদৃষ্টে হযরত মুসান্না (রা.) কিছুটা পিছু হটাই সমীচীন মনে করেন এবং হীরা নগরী থেকে কুফার অনতিদূরে খাফফান নামক স্থানে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করেন। অপরদিকে রুস্তম সেনাতৎপরতা অব্যাহত রাখে। সে শক্তিশালী সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে পৃথক পৃথক দুটি রাস্তায় মুসলমানদের ওপর হামলার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে। একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিল জাবান; যা নামারিক নামক স্থানে ঘাঁটি করে (নামারিকও ইরাকে কুফার নিকটস্থ একটি স্থান) এবং দ্বিতীয় সেনাদল নারসীর নেতৃত্বে কাসকার অভিমুখে প্রেরণ করা হয়। কাসকার বাগদাদ এবং বসরার মাঝে দজলার পশ্চিম তীরস্থ একটি শহর যার প্রভাবে মধ্যের শহর আবাদ ছিল। হযরত মুসান্না মদীনা থেকে সবে এক মাস পূর্বে এসেছিলেন, হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মুজাহেদিনের সেনাদল নিয়ে তাঁর সাথে খাফ্ফানে মিলিত হন। খাফ্ফানও কুফার নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। আর কয়েক হাজার যোদ্ধাসম্বলিত এই মুসলিম সেনাদল যুদ্ধক্ষেত্রে তখন গিয়ে উপনীত হয় যখন ইরাকের সার্বিক অবস্থা মু সলমানদের জন্য সুখকর ছিল না আর বিজিত জেলাসমূহ একটি একটি করে তাঁদের হস্তচ্যুত হচ্ছিল। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) খাফ্ফানে সেনাদল একীভূত করার লক্ষ্যে কয়েকদিন অবস্থানের পর নামারেক –এর দিকে যাত্রা করেন। সেখানে দুর্ধস্ব এক ইরানী সেনাদল যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ইরানী বর্ষীয়ান সেনাপতি জাবানের নেতৃত্বে শিবির স্থাপন করে রেখেছিল। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সেনাদল সুবিন্যস্ত করলেন। অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেন হযরত মুসান্নার স্কন্ধে, ডানদিক আগলে রাখার জন্য নেতৃত্ব ওয়ালেক বিন জিদারাকে দিলেন আর বামদিকের নেতৃত্বের জন্য আমর বিন হায়সামকে মনোনীত করলেন। ইরানী সেনাদলের উভয় পাশের নেতৃত্ব আগলে রাখছিল জুশনাদ মাআ এবং মারদান শাহ্। এই যুদ্ধে ইসলামী আদর্শ যা প্রদর্শিত হয় সে বিষয়ে মীর মাহমুদ আহমদ সাহেব তার মন্তব্যে বলেন, ইসলামী আদার্শের একটি দৃষ্টান্ত আমরা দেখি নামারেক নামক স্থানে যেখানে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয় এবং ইরানী সেনাদল পরাজিত হয়। ইরানী সেনাদলের সেনাপতি জাবানকে জীবিত গ্রেফতার করা হয় কিন্তু মাতার বিন ফিযাহ– যিনি জাবানকে গ্রেফতার করেছিলেন তাকে চিনতেন না। জাবান তাঁর (তথা মাতার বিন ফিযহ'র) অপরিচিতির সুযোগ নিয়ে তাকে ফিদিয়া প্রদান করে ছাড়া পেয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর মুসলমানরা জাবানকে পুণরায় গ্রেফতার করে হযরত আবু উবায়েদের কাছে নিয়ে এসে ইরানী সেনাদলে জাবানের মর্যাদা সম্পর্কে অবগত করল? কিন্তু এক ব্যক্তি যাকে এক মুসলমান একবার ফিদিয়া গ্রহণ করে মুক্ত করে দিয়েছে তাকে পুণরায় বন্দী করা হবে তা হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সহ্য করলেন না। লোকেরা একই কথা পুণঃব্যক্ত করল যে, জাবান তো তাদের মাঝে বাদশাহ স্বরূপ। তিনি বললেন, তবুও আমি চুক্তিভঙ্গ করতে পারি না। অতএব তাকে মুক্ত করে দেয়া হয়। এ ঘটনার মাধ্যমে ইসলামী বাহিনীর সেই আচরণবিধির ওপর আলোকপাত হয় যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল। আর বুঝা যায় যে,মুসলমানরা যুদ্ধগত স্বার্থসিদ্ধি করার সুবর্ণসুযোগ হাতে আসার পরও নৈতিক আদর্শকে নিজেদের হাতছাড়া হতে দিতেন না।

(তারিখে ইসলাম বাআহদে হযরত উমর রা., প্রণেতা– সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৯–১২) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড,পৃ: ৩৬২–৩৬৩) (আল মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড,পৃ: ৩৫১)

এরপর সাকাতিয়া যুদ্ধাভিযান যেটি তের হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। নামারেক যুদ্ধাভিযানে পরাভূত হয়ে ইরানী সেনাদল কাস্কারের দিকে চলে যায় যেখানে পূর্বেই ইরানী সেনাপতি নারসী একদল সৈন্যসহ মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। আবু উবায়েদ (রা.) তার মোকাবিলা করার লক্ষ্যে কাস্কারের দিকে অগ্রসর হন। কাস্কারে অবস্থানরত ইরানী সেনাপতি নারসী

ইরানী ইরাকী সম্রাজ্যে বিশেষ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল। সে ও তার সেনাদলের উভয় বাহুর সেনাপতি বিন্দাবিয়া এবং তিরাবিয়া সাসানী বা ইরানী বাদশাহ্দের নিকটাত্মীয় ছিল। ইরানী দরবারে নামারেকের পরাজয়ের সংবাদ পৌঁছলে রুস্তম নারসীর জন্য অধিক সেনাবল প্রেরণের বন্দোবস্ত করছিল। তখন হযরত আবু উবায়েদ (রা.) নিজ সেনাদলের গতি বৃদ্ধি করে নারসীর সেনাদলকে তাদের সহায়তাকারী সেনাদল আসার পূর্বেই কাস্কারের নিম্নাঞ্চলে গিয়ে তাদের ওপর আক্রমণ করে বসল। আর সাকাতিয়া নামক প্রসিদ্ধ ময়দানে এক দুর্দান্ত যুদ্ধাভিযানের পর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মুসলমানরা জয়যুক্ত হয়। বড় যুদ্ধাভিযানের পর হযরত আবু উবায়েদ (রা.) কাসকারের আশপাশের এলাকায় সংঘবদ্ধ শত্রুর মোকাবিলা করার জন্য ইসলামী ক্ষুদ্র সেনাদলও পাঠানো শুরু করলেন।

(তারিখে ইসলাম বাআহদে হযরত উমর রা., প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১২,১৩)

এরপর রয়েছে বারুসামা যুদ্ধাভিযান। এটিও তের হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। কাসকার ও সাকাতিয়ার মাঝে একটি জায়গার নাম ছিল বারুসামা যেখানে ইরানী সেনাপতি জালিনুসের সাথে সংঘর্ষ হয় যে প্রকৃতপক্ষে জাবানের সাহায্যার্থে আগমন এসেছিল।নারসীর সাহায্য চেয়ে রুস্তম ইরানের কমাণ্ডারের নেতৃত্বে একটি সৈন্যবাহিনী কাসকার অভিমুখে প্রেরণ করেছিল। আবু উবায়েদ পূর্বেই এই সংবাদ পেয়ে গিয়েছিলেন আর তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জালিনুসের সৈন্যবাহিনী আসার পূর্বেই নারসির সৈন্যবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং তাকে পরাজিত করার মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর সামরিক শক্তিকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিলেন। জালিনুস তখন বারুসামা এলাকার বাকুসিয়াসা নামক স্থানে সৈন্যবাহিনী নিয়ে পৌছে। বসরা এবং কুফার মধ্যবতী জনপদকে সাওয়াত বলা হতো আর বারুসামা ও বাকুসিয়াসা এই জনপদগুলির মাঝে দুটি জনবসতি। আবু উবায়েদ বাকু সিয়াসা পৌঁছে যান এবং সংক্ষিপ্ত যুদ্ধের পর ইরানী সৈন্যবাহিনী পরাস্ত হয় আর জালিনুস যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যায়। আবু উবায়েদ সেখানে অবস্থান করে আশপাশের সকল এলাকা নিজের আয়ত্তে নিয়ে নেন। এটি ঐতিহাসিক তাবারীর বর্ণনা। বিলাদারী লিখেছে, জালিনুসের সাথে সন্ধি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরবতী ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ইবনে খলদুন এবং ইবনে আসীর তাবারীর সমর্থন করেছিল।

(তারিখে ইসলাম বাআহদে হযরত উমর রা., প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ৯-১২) (সীরাতুল মোমেনীন উমর বিন খাত্তাব, প্রণেতা- আসসালাবি, পৃ: ৩৫৭) (মুজামুল বালদান, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬১)

জিসারের যুদ্ধের বর্ণনা কিছুদিন পূর্বে করা হয়েছিল আর এখানেও এটি বর্ণনা করা জরুরী বিধায় বলে দিচ্ছি। জিসারের যুদ্ধ ১৩ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। ফুরাত নদীর তীরে মুসলমান এবং ইরানীদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সৈন্যপ্রধান ছিলেন হযরত আবু উবায়েদ সাকাফী (রা.) এবং ইরানীদের সেনাপতি ছিল বাহমান জাযভিয়া। মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ হাজার পক্ষান্তরে ইরানী সৈন্যবাহিনী ছিল ৩০ হাজার এবং ৩০০ হাতী ছিল তাদের কাছে। ফুরাত নদী মাঝখানে প্রতিবন্ধক হওয়াতে দুই পক্ষের মধ্যে কিছুদিন যুদ্ধ হয় নি। অতঃপর উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে নদীর উপর জিসার, অর্থাৎ একটি পুল বানানো হয়আর এই পুলের কারণে এই যুদ্ধকে জিসারের যুদ্ধ বলা হয়। পুল নির্মিত হলে বাহমান জাযভিয়া হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-কে সংবাদ প্রেরণ করেন যে, এখন তুমি নদী অতিক্রম করে আসবে নাকি আমাদেরকে অতিক্রম করার অনুমতি প্রদান করবে? হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-চাইতেন যে, মুসলমান সৈন্যরা নদী অতিক্রম করে বিরুদ্ধবাদীদের সাথে যুদ্ধ করবে যদিও সেনাপতি হযরত সালীদ (রা.) ভিন্ন মত পোষণ করেন। হযরত আবু উবায়েদ ফুরাত নদী পার হয়ে পারস্য বাহিনীর উপর আক্রমণ করেন। কিছু সময় পর্যন্ত এভাবেই যুদ্ধ চলতে থাকে। কিছুক্ষণ পর বাহমান জাযভিয়া নিজ সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষিপ্ত হতে দেখে হা তিগুলোর সামনে নিয়ে আসার নির্দেশ দেয়। হাতিগুলো অগ্রসর হওয়ার কারণে মুসলমানদের সারির শৃংখলা ভঙ্গ হয়ে যায় এবং মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিশৃংখল হয়ে যেতে থাকে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা হা তির ওপর আক্রমণ চালাও এবং তাদের শুঁড়গুলো কেটে ফেল। হযরত আবু উবায়েদ এটি বলে নিজে সামনে অগ্রসর হন এবং এক হাত দিয়ে আক্রমণ করে একটি শুঁড় কেটে ফেলেন। অন্যান্য সৈন্যরা এটি দেখে ক্ষীপ্রতার সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন এবং অনেকগুলো হা তির শুঁড় ও পা কেটে দিয়ে সেগুলোর আরোহীদের হত্যা করে। দৈবক্রমে হযরত আবু উবায়েদ একটি হাতির সামনে পড়ে যান। তিনি হাতির উপর আক্রমণ করে শুঁড় কেটে ফেলেন কিন্তু তিনি সেটির পায়ের নিচে পড়ে যান এবং পিষ্ট হয়ে শহীদ হন।

তাবারীর ইতিহাস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত আবু উবায়েদ (রা.)-এর স্ত্রী দুমাহ্ যুদ্ধের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, এক ব্যক্তি আকাশ থেকে একটি পাত্রে জান্নাতের শরবত নিয়ে এসেছে যা হযরত আবু উবায়েদ এবং জাবার বিন আবু উবায়েদ পান করে। একইভাবে তাদের পরিবারের আরো কিছু সদস্য তা পান করে। দোমা এই স্বপ্নের কথা তার স্বামীর কাছে বর্ণনা করে। হযরত আবু উবায়েদ (রা.) বলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা হল শাহাদত। এরপর হযরত আবু উবায়েদ (রা.) লোকদের কাছে ওসিয়্যত করে যান, আমি যদি শহীদ হই তবে জাবার যুদ্ধের নেতৃত্ব দিবে, সে যদি শহীদ হয় তবে অমুক অমুক ব্যক্তি সেনাপতি নিযুক্ত হবে। অতএব সেই স্বপ্নের মধ্যে যারা শরবত পান করেছিল তাদেরকে হযরত আবু উবায়েদ (রা.) সেই ক্রম অনুসারে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি (রা.) বলেন, যদি আবুল কাশেমও শহীদ হয়ে যায় তাহলে হযরত মুসান্না তোমাদের সেনাপতি হবে। দোমাহ্র এ স্ব প্ন অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়। এ যুদ্ধে হযরত আবু উবায়েদের পর পর্যায়ক্রমে বর্ণিত ছয় ব্যক্তি একে একে নেতৃত্বের পতাকা হাতে নিতে থাকেন এবং শহীদ হতে থাকেন। অষ্টম ব্যক্তি ছিলেন হযরত মুসান্না যিনি ইসলামী পতাকা নিয়ে পুনরায় পূর্ণ উদ্যমে আক্রমনের সংকল্প করেন। কিন্তু ইসলামী সৈন্যদের সারি বিশৃঙ্খল হয়ে গিয়েছিল আর লোকেরা ক্রমাগত সাতজন সেনাপতিকে শহীদ হতে দেখে পালাতে আরম্ভ করেছিল,কেউ কেউ নদীতে লাফিয়ে পড়ে। হযরত মুসান্না এবং তার সঙ্গীরা বীরত্বের সাথে লড়তে থাকেন। পরিশেষে হযরত মুসান্না আহত হন এবং তিনি লড়াই করতে করতে ফোরাত নদী পার হয়ে ফেরত চলে আসেন। এ ঘটনায় মুসলমানদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মুসলমানদের চার হাজার লোক শহীদ হয় যেখানে ইরানীদের ছয় হাজার সেন্য মারা যায়। এ পরাজয় মুসলমানদের জন্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষয়-ক্ষতির কারণ হতে পারত, কিন্তু সৌভাগ্যজনকভাবে এমন অলৌকিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, শত্রুরা মুসলমানদের পিছু ধাওয়া করতে পারে নি। কেননা ইরানী সাম্রাজ্যগুলোতে অভ্যন্তরীণ বিরোধ সৃষ্টি হওয়াতে বহ্মান জাযুবিয়াকে ফিরে হয়। ইবনে আসীর এর কারণ সম্পর্কে লিখেন, স্বয়ং ইরানের রাজধানী মাদায়েনে পারস্য সাম্রাজ্যের এক ব্যক্তি রুস্তমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে।

(তারিখে ইসলাম বাআহদে হযরত উমর রা., প্রণেতা- সৈয়্যদ মীর মাহমুদ আহমদ নাসের, পৃ: ১৮-২১) (তারিখে তাবারী, ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ: ২২৯) (তারিখ ইবনে খালদুন, ৩য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃ: ২৭০-২৭৩) (আল কামিলু ফিত তারিখ লি ইবনে আসীর, পৃ: ৩১১)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) জিস্রের যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বর্ননা করেছেন: জিস্রের যুদ্ধে মুসলমানদের সবচেয়ে বড় এবং ভয়াবহ পরাজয় বরন করতে হয়। ইরানীদের মোকাবেলার জন্য মুসলমানদের বিশাল সৈন্যবাহিনী গিয়েছিল। ইরানী সেনাপতি নদীর অপর তিরে সেনাব্যুহ স্থাপন করে এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করে। ইসলামী সেনাবাহিনী পূর্ণ উদ্দমে তাদের উপর আক্রমন করে এবং তাদেরকে পিছু হটিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু এটি ইরানী সেনাপতির রণকৌশল ছিল। সে একপাশ দিয়ে একটি সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে পুল দখল করে এবং মুসলমানদের উপর তীব্র আঘাত হানে। মুসলমানগণ বাধ্য হয়ে পিছু হটে, কিন্তু দেখতে পায় শত্রুরা পুল দখল করে নিয়েছে। তারা দিশেহারা হয়ে অন্য দিকে সরে যায়। তখন শত্রুরা তীব্র আঘাত হানে আর মুসলমানদের সিংহভাগ নিরুপায় হয়ে নদীতে ঝাপিয়ে পড়ে এবং নিহত হয়। মুসলমানদের এ ক্ষয়ক্ষতি এত ব্যাপক ছিল যে মদীনাও এতে প্রকম্পিত হয়। হযরত উমর (রা.) মদীনাবাসীদেরকে একত্রিত করে বলেন, এখন মদীনা ও ইরানের মাঝে কোন প্রতিবন্ধক অবশিষ্ট নেই। মদীনা সম্পূর্ন অরক্ষিত এবং সম্ভবত শত্রুরা কিছুদিনের মধ্যেই এখানে পৌঁছে যাবে। এজন্য আমি নিজে সেনাপতি হয়ে যেতে চাই। বাকী লোকেরা এ সিদ্ধান্ত পছন্দ করল, কিন্তু হযরত আলী বল্লেন, যদি খোদা নাখাস্তা আপনার কিছু হয়ে যায় তবে মুসলমানগণ বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং তাদের শৃঙ্খলা ও ঐক্য বিনষ্ট হবে। এজন্য আপনি স্বয়ং না গিয়ে অন্য কাউকে পাঠানো সমিচীন হবে। তখন হযরত উমর হযরত সা'দকে, যিনি সিরিয়ায় রোমীয়দের সাথে যুদ্ধে নিয়োযিত ছিলেন, লিখেন তুমি যতটা পার সৈন্য পাঠিয়ে দাও। কেননা এখন মদীনা সম্পূর্ন অরক্ষিত হয়ে গেছে। শীঘ্রই সৈন্যবাহিনীকে যদি প্রতিহত না করা হয় তবে তারা মদীনা দখল করে নেবে।"

(আনোয়ারুল উলুম, খন্ড=২২, পৃ ৫৬-৫৭)

এই যে স্মৃতিচারণ চলছে এর ধারা পরবর্তীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এটি তো যুদ্ধ-সংক্রান্ত বর্ণনা ছিল, এর আরো বিস্তারিত এবং বাকী যুদ্ধগুলোরও বিস্তারিত পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এখন আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তিরও স্মৃতিচারণ করতে চাই যাদের জানাযাও

যুগ খলীফার বাণী

পরকালের বিষয়ে চিন্তিত এবং আল্লাহ্র ভয়ে ভীত ব্যক্তি সর্বপ্রথম নিজের ইবাদতের হিফাযতের বিষয়ে মনোযোগী হয়।

(খুতবা জুমা, ৪ঠা অক্টোব, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

পড়াব, ইনশাআল্লাহ্। এদের মধ্যে প্রথটি হল ফাতহি আব্দুস্ সালাম সাহেবের; তার পুরো নাম ফাতহি আব্দুস সালাম মুবারক সাহেব। তিনি মিশরের বাসিন্দা ছিলেন। সম্প্রতি তিনি৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার পিতা নকশবন্দী তরিকার অনুসারী ছিলেন। তিনি তার এক সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষার জন্য ওয়াক্ফ করার সংকল্প করেন এবং একাজের জন্য ফাতহি সাহেবকে বেছে নেওয়া হয়। ফাতহি সাহেব দশ বছর বয়সেই পবিত্র কুরআন হিফয সম্পন্ন করেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসার কারণে ফাতহি সাহেবেরপিতাও তার সাথে পবিত্র কুরআন হিফয করা আরম্ভ করেন এবং পুরোকুরআন হিফয করেন। পরবতীতে আল্লাহ্র এমনই কৃপা হয় যেতার পিতা ৮৮ বছর বয়সে বয়আতও করে নেন। পবিত্র কুরআন হিফয করার পর ফাতহি সাহেব আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন এক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে পড়ালেখা সম্পন্ন করেন। এরপর তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকৌশলবিদ্যায় ডিগ্রি অর্জন করেন। ছাত্রজীবনে অধ্যয়নের প্রতি পরম আগ্রহের কারণে নিজের পকেট খরচ থেকে অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে বই-পুস্তক ক্রয় করতেন এবং অধ্যয়ন করতেন। এরপর তিনি মিশরের বিমানবাহিনীতে অফিসার নিযুক্ত হন। বিমানবাহিনীতে তার বিরুদ্ধে এই অপবাদআরোপ করা হয় যে তিনি কতিপয় বৈপ্লবিক সংগঠনের গোপন ষড়যন্ত্রে জড়িত আছেন, অথচ তিনি এসবের বিরোধি ছিলেন এবং তাদের সংশোধনের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। যাহোক, এই অভিযোগে কিছুকাল কারাভোগের পর তাকে নির্দোষ সাব্যস্ত করা হয়। এরপর তিনি ইরাক চলে যান। কিছুকাল সেখানে প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেন। ১৯৯১ সনে ইরাক-যুদ্ধের সময় তিনি খুবই ভয়ংকর সময় অতিবাহিত করেন; যে অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন সেখানে একরাতেই দশটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি নিজ পরিবারসহ দোয়ায় রত থাকেন এবং আল্লাহ্ তা'লা আশ্চর্যজনকভাবে তাদেরকে রক্ষা করেন। এরপর তিনি জর্ডানে চলে আসেন এবং মু'তাযিলা ফিরকার সাথে সম্পৃক্ত হয়েপড়েন। এরপর মিশরে আসেন, সে সময় তিনি আহলে কুরআন ফির্কার প্রতি কিছুটা আকৃষ্ট ছিলেন; এরইমধ্যে আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন। আহমদীয়াতের মাঝে তিনি সব উদ্বেগজনক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়ার ফলে বয়আত করে নেন। ফাতহি সাহেব নিজেই তার বয়আতগ্রহণের ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেন: "১৯৯৫ সালে মিশরে ইবনে খালদুন নামক একটি জ্ঞানকেন্দ্রে বিভিন্নবক্তৃতা হতো, সেখানে আমারও অনেকবার বক্তৃতা দেয়ার এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর দেয়ার সুযোগ হয়েছে । ১৯৯৮ সালে মোকাররম মোস্তফা সাবেত সাহেব এই পাঠকেন্দ্রে আমার বক্তৃতা শুনে ভূয়সি প্রশংসা করেন এবং নিজের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। তার বাড়িতে আমাকে তিন ঘণ্টার একটি ভিডিও ক্যাসেট দেখানো হয়। এই ভিডিওতে মোকাররম মরহুম হিলমী আশ-শাফি সাহেব দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীসে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়ের এমন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন যা আমার খুবই পছন্দ হয় ।" ফাতহি সাহেব বলেন, "আমার জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে মরহুম মোস্তফা সাবেত সাহেব বলেন, 'এটি হলো দাজ্জালবধকারী প্রতিশ্রুত মসীহর তফসীর'।" তিনি বলেন, "১৯৯৯ সনে মোস্তফা সাবেত সাহেব আমাকে ইসলামী নীতিদর্শন পুস্তক প্রদান করেন যা আমার মাঝে এক অদ্ভুত আলোড়ন সৃষ্টি করে,আর আমি ইমাম মাহদী সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমি আমার ব্যক্তিগত গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত ছিলাম যে নাসেখ-মনসুখ সংক্রান্ত বিশ্বাস ভ্রান্ত এবং এটি পবিত্র কুরআনের সম্মানের পরিপন্থী। তাছাড়া আমি ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলাম। আহমদীয়াতের বিষয়ে যখন গবেষণা শুরু করলাম তখন দেখলাম- আহমদীয়াত তো একই বিষয় প্রচার করছে! এরপরকুরআনের কতিপয় আয়াত সম্পর্কে আমি জানতে চাইলে মোস্তফা সাবেত সাহেব আমাকে Five volume commentary দিয়ে বলেন, 'এতে আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আছে।' আমি দেখলাম, এতে আমার সকল প্রশ্নের উত্তর আমারই চিন্তাধারা অনুযায়ী এবং আমি যেমনটি আশা করেছিলাম- হুবহু তেমনিভাবে বিদ্যমান রয়েছে।" ফাতহি সাহেব বলেন, "আমি অনেক চিন্তাভাবনা করলাম; ঐশীওহী লাভের মিথ্যা দাবী করা তো নিঃসন্দেহে মহাপাপ, কিন্তু যেসব বিষয় নিয়ে ইমাম মাহদী (আ.) এসেছেন সেগুলো সবই সত্য, হেদায়েত ও আধ্যাত্মিকতা সম্বলিত বিষয়। দু'একটি বিচ্ছন্ন বিষয় তো যে কেউই বলে দিতে পারে, কিন্তু এত এত সত্য তত্ত্বজ্ঞান, তাও আবার এত ব্যাপক সংখ্যায়- এমনটি তো এই পুরো শতাব্দীতে কাউকে আল্লাহ তা'লা প্রদান করেন নি! তবে কি আল্লাহ তা'লা এই মহান পুরস্কারে এমন এক ব্যক্তিকে ভূষিত করেছেন যে ব্যক্তি মহা অন্যায় করত ঐশী ওহী লাভের দাবী করেছে!!" তিনি বলেন,"অবশেষে দোয়ার মাধ্যমে, পড়াশোনা ও চিন্তাভাবনা করে ২০০১ সালে মোস্তফা সাবেত সাহেব যখন মিশর আসেন তখন আমি তাকে বললাম, 'আমি ইমাম মাহদী (আ.)-এর প্রতি ঈমান এনেছি।' আবেগের আতিশয্যে এক মুহূর্তের জন্য তিনি আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। এরপর আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী রচনাবলী অধ্যয়ন আরম্ভ করি, আর সেগুলো তথ্য ও তত্ত্বের একউত্তাল মহাসমুদ্র হিসেবে আমার সামনে উদ্ভাসিত হয়।"জামাতের জন্য ফাতহি সাহেবের জ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত সেবাসমূহ নিম্নরূপ ২০০৫ সালে হযরত মুসলেহ্ মওউদ কর্তৃক প্রণীত পুস্তক 'হায়াতে মুহাম্মদ (সা.)'-এর ইংরেজি অনুবাদ খরভব ড়ভ গঁযধসসধফ আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন। 'আল-হিওয়ারুল মুবাশির' অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন এবং অত্যন্ত আবেগ-উচ্ছাসের সাথে দালিলিক ও বিস্তারিত উত্তর দিতেন যা দর্শকরা খুবই উপভোগ করতেন। মিশরের একজন খ্রিস্টান পাদ্রী কুরআন শরীফের ওপর আপত্তিমূলক ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করে যার নাম ছিল 'হালিল কুরআনু কালামুল্লাহ্' অর্থাৎ 'কুরআন কি আল্লাহ্র বাণী?' এর উত্তরে ফাতিহ সাহেব ২০০৬ সালে ধারাবাহিক কয়েকটি অনুষ্ঠান রেকর্ড করান যার নাম ছিল 'না'আম- ইন্নাহু কালামুল্লাহ্' অর্থাৎ 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই এটি আল্লাহ্রই বাণী'। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী কাসিদাসমূহের ব্যাখ্যাসম্বলিত অনুষ্ঠান 'রূহুল কুদুস' করেন, যেখানে কবিতাগুলোর শব্দগত ও অর্থগত নিদর্শন খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেন। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেছেন যার মধ্যে 'নু বু ওয়াতুন তাহাক্কাকাত' অর্থাৎ সত্যপ্রমাণিত 'ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ , বারাহীনে আহমদীয়ার তত্ত্বজ্ঞান, 'ফী সামাওয়াতিল কুরআন', ইসলামের ইতিহাস ও খাতামুন্নাবীঈন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া তিনি জামাতেরও বিভিন্ন সেবা করেছেন। স্থানীয় জামাতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সেক্রেটারী তবলীগ হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি ওয়াকফে আরযীও করেছেন; কয়েক বছর তিনি ওয়াকেফে জিন্দেগী হিসেবে জামাতের কাজ করেছেন। জামাতের নামায সেন্টারে দরসও প্রদান করতেন।

তার পুত্র ইব্রাহীম ফাতহি সাহেব বলেন, "মরহুম আব্বাজান সূরা ফাতিহার আলোকে সত্য জীবন যাপনকারী মানুষ ছিলেন; তার জীবন খিলাফতরূপী নিয়ামতের জ্যোতিতে জ্যোতির্মণ্ডিত ছিল। যুগ-খলীফার জন্য ভালবাসা ওশ্রদ্ধার আশ্চর্য আবেগ রাখতেন। তার মতে, সকল সমস্যার সমাধান এবং যাবতীয় বিষয় ও সমস্যাবলী বুঝবার ও আল্লাহ্ তা'লার পানে যাওয়ার পথ জানতে পারার কেবল একটিই পদ্ধতি রয়েছে, আর তা হল খিলাফত।" তিনি লেখেন,"'শ্রদ্ধেয় পিতা কথায় ও কাজে পরিপূর্ণ সত্য অবলম্বনের জন্য সুপরিচিত ছিলেন। প্রত্যেক কাজের পূর্বে সবসময় দোয়া করতেন এবং খোদা তা'লার নিকট কেঁদে-কেঁদে সাহায্য প্রার্থনা করতেন। যদি কেউ তাকে বলতো, 'আমাকে উপদেশ দিন' তাহলে তাকে বলতেন, 'দোয়া কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ)-এর দিশা যাচনা কর, আর যুগ-খলীফার কাছে দোয়ার জন্য লেখ।' তিনি গভীর পাণ্ডিত্য ও বিস্তৃত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন; বিস্তর পড়াশোনা ছিল তার। সবরকম পুস্তকাদি পড়তেন এবং নতুন নতুন চিন্তাধারা ও আধুনিক গবেষণা বুঝার চেষ্টায় ব্যাপৃত থাকতেন। অধ্যয়নের নির্যাশ ধর্মীয় সূক্ষ্ম বিষয়াদি বুঝার ও বুঝানোর কাজে ব্যয় করতেন। পঠন-পাঠনে তার রীতি খুবই সুন্দর ছিল, পাঠদানের সময় কখনও কখনও তিনি হাস্যরসও করতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রচনাবলী সবসময় পড়তেন এবং তা থেকে তত্ত্বজ্ঞানের মণিমাণিক্য উদ্ঘাটন করে সেগুলো নিজের দৈনন্দিন জীবনের আলোকবর্তিকারূপে গ্রহণ করতেন। জুমুআর দিন নিজের বক্তৃতায় ও এমটিএ-র অনুষ্ঠানসমূহে এসব তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করতেন। ধর্মসেবার গভীর আবেগ রাখতেন।" তিনি আরও বলেন, "অসুস্থ হয়ে যখন হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তখন শ্বাসকষ্ট সত্ত্বেও নার্সদেরকে আহমদীয়াতের তবলীগ করতে থাকেন। মানুষজনকে যেসব উত্তম চারিত্রিক আদর্শের উপদেশ দিতেন, বাড়িতে নিজে সেগুলো পালন করে দেখাতেন। স্বাচ্ছন্দ্য ও কাঠিন্য- উভয় অবস্থাতেই তাকওয়া ও সত্যবাদিতাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সাক্ষাতের তার গভীর আকাঙ্ক্ষা ছিল। প্রায়শঃ বলতেন, 'এই পৃথিবীর কোন মূল্যই নেই; এই পৃথিবীতে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার মাঝে প্রকৃত মুক্তি নিহীত।'অধিকাংশ সময় খোদাতা'লার সাক্ষাৎ লাভের বাসনার কথা বলতেন। তার পুত্র বলেন, অন্তিম দিনগুলোতে আমাকে কখনো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখলে বলতেন, আমার পাশে বসে সূরা ফাতিহা ও বার বার দরূদ শরীফ পাঠ কর, কেননা কেবলমাত্র আল্লাহ্ তা'লার আদেশেই রোগ থেকে মুক্তি লাভ হয়; কেবল তিনিই সঠিক ঔষধের জ্ঞান রাখেন। তঁ ার আদেশ ছাড়া চিকিৎসা কিছুই করতে পারে না।আমি পৃথিবীর কোন পরোয়া করি না, বরং আমি খোদা তা'লার সাক্ষাৎ লাভের আকাঙ্ক্ষী। তার ছেলে লিখেন, আমার মা বলেন, আমার স্বামী সর্বদা জামা'তের সেবাকে সকল কাজের ওপর প্রাধান্য দিতেন। বেশীরভাগ সময় তবলীগি কাজে ঘরের বাহিরে কাটাতেন। এরইকল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সন্তানদের অলৌকিকভাবে সুরক্ষা করতেন।

ডাক্তার হাতেম হিলমি শাফি সাহেব লিখেন, আমাদের ভাই এবং শিক্ষক মোকাররম ফাতহি আবদুস সালাম সাহেব সত্যিই সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, মু 'মিনদের মাঝে এমন কিছু মানুষ রয়েছে যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে। ডাক্তার হাতেম সাহেব বলেন, তার বয়আত থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যুগে তাকে একজন বিস্ময়কর মানুষরূপে দেখেছি। তার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সত্তা, গুণাবলী এবং একত্ববাদের প্রতি ভালোবাসার এক নেশা ছিল। তিনি মহানবী (সা.) এবং পবিত্র কুরআনের

প্রেমিক ছিলেন। সূরা ফাতিহার ভালোবাসায় মগ্ন ছিলেন। তার মূল্যবান দরসসমূহে তাকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সূরা ফাতিহার তফসীরের গগণে বিচরণ করতে দেখা যেত।

জর্ডানের হোসেন আল মিসরী সাহেব লিখেন, ফাতেহ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং কাদিয়ানের প্রতি গভীর ভালোবাসারাখতেন। খিলাফতের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখতেন, অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি তার একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন যে, ২০১৮ সালের কাদিয়ান জলসায় তারা একসাথে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন আমি কাদিয়ান পেঁ ৗছাই তখন আমাকে সারায়ে ওয়াসীমে থাকতে দেয়া হয়। সেখানে ফাতেহ সাহেব আমার সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সাক্ষাৎ করেন। জলসার অধিবেশন শেষে রাতে তিনি আমার সাথে বারাহীনে আহমদীয়ার আলোচনা শরু করতেন। তিনি কাদিয়ানের প্রেমিক ছিলেন। কাদিয়ান সম্পর্কে তিনি বলতেন, এটি আমাদের প্রিয়ের প্রিয় গ্রাম। আমরা একসাথে কাদিয়ানের পবিত্র স্থানসমূহ ঘুরে দেখি। তিনি বলেন, আমি অবাক হয়েছি, ফাতেহ সাহেব সকল জায়গার ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান রাখতেন! তার কাদিয়ান থেকে বিদায়ের দিন আমরা ফযরের নামাযের পর বায়তুয্ যিকর ও বায়তুদ্ দোয়ায় যাই। সেখানে তার বিগলিত চিত্তে দোয়া দেখে আমিও নিজেকে সামলাতে পারিনি। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা যখন বেহেশতি মাকবেরার চত্তরে পেঁ ৗছি তখন তিনি অবাকদৃষ্টিতে এদিক সেদিক তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর আমি যখন তাকে কারণ জিজ্ঞেস করি তখন তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন এবং এরপর মাটিতে সিজদায় লুটিয়ে পড়েন। সিজদা থেকে উঠে আকাশের দিকে হাত উঠিয়ে কম্পিত কণ্ঠে বলেন, হে খোদা! তুমি জান, আমার প্রিয়ের সাহচর্যে থাকা আমার কাছে কতটা প্রিয়। হে খোদা! তুমি জান, আমি আজ রাত এখানেই কাটাতে চাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই যে আমাদের বিদায় মুহূর্ত। আসলে যেদিন এঘটনা ঘটে তাকে সংবাদ দেয়া হয়েছিল যে, সেদিন ফিরে যেতে হবে। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! তুমি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান। সকল কাজ তোমারই কর্তৃত্বে রয়েছে আর তোমার আদেশেই সব সংঘটিত হয় আর । আইন আছে আর আইন পরিবর্তনও হয়। আমার আজকের সফর স্থগিত করে দাও, যাতে আরো কয়েক ঘন্টা আমার চোখের প্রশান্তি লাভ হয়। যাহোক, যা ঘটেছে তা হলো, গাড়ি আসে আরফাতেহ সাহেবের জিনিসপত্র গাড়িতে রাখা হয়। আসলে তাকে বলা হয়েছিল যে সেদিন তার সিট বুক করা হয়েছে। স্বল্পক্ষণ পর সারায়ে ওয়াসীমে ফাতেহ সাহেবের আওয়াজ শুনতে পাই, তিনি বলছিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তিনি বলেন, আমার দয়ালু খোদা আমার দোয়া শুনেছেন আর আমার সফর স্থগিত করে দিয়েছেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার গুণকীর্তনে ব্যস্ত ছিলেন। আমি নীচে নেমে এলে ফাতেহ সাহেব আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, আপনি দেখেছেন! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে আমাদের প্রিয় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বরকতে আমাদের দোয়া কবুল করেছেন আর আশ্চর্যজনকভাবে তিনি কবুল করেন! এরপর তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় আর এ অবস্থা দেখে আমার চোখও অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, আজকে আমার ফ্লাইট- এটি ব্যবস্থাপকদের ভুল হয়েছিল, আসলে সেটি আজ নয় বরং আগামীকাল বা অন্য কোন দিন ছিল। তিনি বলেন, তিনি তার মৃত্যু সম্পর্কেও বুঝতে জেনে গিয়েছিলেন আর এটি তিনি হোসেন সাহেবকে জানিয়েছিলেন। এছাড়া এম.টি.এ.-এর জন্য তিনি যে প্রোগ্রাম বানাচ্ছিলেন সেটি কীভাবে বানাতে হবে এর জন্য দিক নির্দেশনাও প্রদান করেন । হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর প্রতি একটি এলহাম হয়েছিল আর তা হলো 'ইয়াদউনা লাকা আবদালুশ্ শামে ওয়া ইবাদুল্লাহে মিনাল আরাব' অর্থাৎ সিরিয়ার পুণ্যবান লোকেরা এবং আরবের অধিবাসী খোদার বান্দারা তোমার জন্য দোয়া করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) লিখেছেন, আল্লাহ্ তা'লাই ভালো জানেন এটি কী বিষয় আর কখন, কীভাবে এটি প্রকাশ পাবে। ওয়াল্লাহু আ'লামু বিস্সোয়াব- আল্লাহ্ই ভালো জানেন।

(তাযকিরা, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ: ১০০)

কিন্তু আমরা বাস্তবেই দেখছি, আল্ল াহ্ তা'লার কৃপায় আরবের যেযেস্থানে জামা'ত প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাদের মাঝেও আর আমি এখন ফাতেহ সাহেবের যে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করলাম তা থেকেও প্রতীয়মান হয় যে, আরবদের মাঝে আশ্চর্যজনকভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিষ্ঠাবান লোকদের সৃষ্টি করছেন, যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি দরূদ ও সালাম প্রেরণ করে এবং প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশও ঘটায়। একথার সাক্ষ্য দিয়ে হাতেম সাহেবও লিখেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর বইপুস্তক ও বিভিন্ন পঙক্তির প্রতি ফাতেহ সাহেবের ভালোবাসা বর্ণনাতীত।

মরহুমের প্রতিটি কথা ও কাজে খিলাফতের প্রতি তার ভালোবাসা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ প্রস্ফুটিত হতো আর সবাই তা দেখতে পেত। তিনি বদ্ধমূল বিশ্বাস ছিল, খিলাফত আল্লাহ্ তা'লার মহান এক নেয়ামত আর তা লাভের কারণে প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার গান গাইতেন। আল্লাহ্র এই রজ্জুকে তিনি দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রেখেছিলেন এবং খিলাফতের আনুগত্যে বিলীন ছিলেন। এটি আমি নিজেও দেখেছি যে, সাক্ষাতের সময় তার চোখ এবং প্রতিটি আচরণে এমন আন্তরিকতা ও ভালোবাসার ছাপ দৃষ্টিগোচর হতো ও ফুটে উঠত যা ছিল অসাধারণ মানের আর একইসাথে শিষ্টাচার ও শ্রদ্ধাবোধও ছিল অঢেল। তিনি অনেক জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে আসতেন, তার কোন কথা বা দলীল যদি আমি বুঝতে না পারতাম আর গ্রহণ না করতাম অথবা আরো গবেষণার জন্য বলে দিতাম তাহলে তিনি তা হাস্যবদনে তা মেনে নিতেন। বস্তুত তিনি খিলাফতের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তি এবং বলিষ্ঠ সাহায্যকারী ছিলেন।

উসামা আব্দুল আযীম সাহেব লিখেন, ফা তেহ আব্দুস সালাম সাহেব অনেক বড় আলেম ছিলেন। বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও খুবই বিনয়ী একজন মানুষ ছিলেন। আমাদের মাঝে সবচেয়ে ছোট জনের সাথেও অত্যন্ত নম্র আচরণ করতেন এবং তার পরামর্শ গ্রহণ করতেন। অনেক বড়মনের অধিকারী ছিলেন, কারো সাথে কোন ভুলত্রুটি হয়ে গেলে সবার সামনেই অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তার কাছে ক্ষমা চাইতেন এবং তার মাথায় চুমু দিতেন। ইসলামের প্রতি মরহুমের গভীর ভালোবাসা ছিল এবং আহমদী যুবকদেরকে জামা'তের এমন সেবক ও সৈনিক বানাতে চাইতেন যাদের মাঝে জ্ঞানও থাকবে আর আধ্যাত্মিকতা। গভীর রাত পর্যন্ত আমাদেরকে উপদেশ দিতেন এবং জামা'তের দায়দায়িত্ব প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। তিনি খুবই কোমল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কেউ তার সাথে রূঢ় হলে তিনি রূঢ় ভাবে উত্তর দিতেন না। আমি নিজেও জানি, কিছু কিছু লোক তাকে খুবই কষ্ট দিয়েছে, তার সাথে কঠোর আচরণ করেছে,কিন্তু কোন কারণে সাময়িকভাবে তার, অর্থাৎ ফাতেহ সাহেবের মুখ থেকে কোন কঠিন শব্দ বের হয়ে গেলে তিনি ক্ষমা চেয়ে নিতেন আর অনেক সময় আমাকেও লিখে দিতেন যে, আমি এই লোকের সাথে অমুক কথা বলেছি এবং তার কাছে ক্ষমাও চেয়েছি। এতবড় হৃদয় খুব কম মানুষের মাঝেই পাওয়া যায়।

তামীম সাহেব লিখেন, অধিকাংশ সময় তিনি বলতেন, খিলাফত ছাড়া ইসলামের কোন কাজই সঠিকভাবে হতে পারে না। আমাদের যে জিনিসটি প্রয়োজন, তা বিভিন্ন-বিবিধ চিন্তাধারার প্রতি আকৃষ্ট করা নয়, বরং আমাদের খলীফার প্রয়োজন, যিনি বিভিন্ন মতভেদের সমাধান দেন এবং ঐশী দিক-নির্দেশনার আলোকে আমাদের পথনির্দেশনা প্রদান করেন। মরহুম সর্বদা এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত ছিলেন যা যুগ-খলীফা মেনে নিতেন না। তিনি বলেন, হুযূর! যখনই তিনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ করে বের হতেন এক অদ্ভুত আনন্দে বিভোর থাকতেন। পরমানন্দ ও ভাবাবেগের সাথে সাক্ষাৎ এবং সেখানে আলোচিত কথোপকথনের উল্লেখ করতেন।ফিলিস্তিনের এক ভদ্রমহিলা সামা সাহেবা বলেন, আমি স্ব প্নে দেখি , যা বাস্তব মনে হচ্ছিল যে, আমি এবং আমার বোন সাহারবসে আছি। সে আমাকে বলছে, তাকে কেউ বলেছে, এক ফিরিশতা এক বৈঠকে বসা আহমদীদের পরিবেষ্টন করে রেখেছিল আর ফাতেহ সাহেব এলে তাকে সে বলে, তুমি সবচেয়ে সুন্দর চমেলী ফুল। একথা শুনে আমি আমার বোনকে বলি, ফাতেহ সাহেব কতইনা পবিত্র সত্তা!

আরবী ডেস্কের তাহের নাদীম সাহেব লিখেন, অনেক বড় আলেম হওয়া সত্ত্বেও তার বিশেষ গুণ ছিল তিনি মূর্তীমান বিনয় ছিলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাণীর প্রতি এমন স্বতঃস্ফূর্ত ভক্তি ও ভালোবাসা ছিল যে, জানি না তিনি বারাহীনে আহমদীয়া কতবার পড়েছেন আর এর নতুন নতুন অর্থ বের করে উপস্থাপন করতেন। এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি প্রোগ্রামও রেকর্ড করিয়েছেন।

আমরা সবাই জানি, তিনি জলসারও শোভা ছিলেন। অত্যন্ত বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন আর শেষ দিন তিনি উদ্দীপ্ত নারা উচ্চকিত করতেন, তার নারা বা স্লোগানে এক ধরনের উচ্ছাস-উদ্দীপনা থাকত আর মনে হতো যেন হৃদয়ের গভীর থেকে এ আওয়াজ উৎসারিত হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততিকেও তার পদাঙ্ক অনুসরণে পথ চলার সৌভাগ্য দিন এবং সন্তানদের জন্য তার দোয়াসমূহ কবুল করুন আর তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ শ্রদ্ধেয়া রাজিয়া বেগম সাহেবার। তিনি কানাডার সাবেক মু বাল্লেগ ইনচার্জ এবং সিয়েরা লিওনের সাবেক আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ খলীল মুবাশ্বের আহমদ সাহেবের সহধর্মিণী ছিলেন। তিনিও বিগত কিছুদিন পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। খলীল সাহেব লিখেন, আমার সহধর্মিণী রাজিয়া বেগম সাহেবা তবলীগের ময়দানের সুদীর্ঘ যুগে নিজের ওয়াকফ স্বামীর সাথে সমান তালে ধৈর্য, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে জামা'তের সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন । বিশেষ করে আফ্রিকায়আতিথেয়তা ও সেবা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন। কখনো কোন অযৌক্তিক দাবি করেন নি এবং সর্বদা ধৈর্য ও কৃ তজ্ঞতার সাথে ওয়াকফে জিন্দেগী স্বামীর সাথে একযোগে ধর্মসেবার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুমা নিয়মিত ইবাদতবন্দেগী করতেন এবং সদকা-খয়রাত ও আর্থিক কুরবানীর ক্ষেত্রে আন্তরিক উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করতেন। মৃত্যুর পূর্বেই সকল খাতের চাঁদা পরিশোধ করেন। মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি এক পুত্র এবং তিন কন্যা

আর তাদের সন্তানসন্ততি রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হলো ডা. সুলতান মুবাশ্বের সাহেবের স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া সায়েরা সুলতান সাহেবার। হৃদযন্ত্রের বিকল হওয়ার কারণে সম্প্রতি তারও মৃত্যু হয়, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن । তিনিও লাজনা ইমাইল্লাহ্, পাকিস্তানের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। 'খিদমতে খালক বা সৃষ্টিসেবা' বিভাগে বিশেষভাবে সেবার করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার স্বামী ডা. সুলতান মুবাশ্বের সাহেব লিখেন, তিনি জামা'ত ও খিলাফতের প্রতি পরম বিশ্বস্ত ছিলেন। তিনি এ কারণে খুবই আনন্দিত ছিলেন যে আমাদের ঘর মসজিদে মুবারকের নিকটে। তার বিয়ের পূর্বেই তার শাশুড়ি পরলোকগত ছিলেন কিন্তু তার শ্বশুর মওলানা দোস্ত মুহাম্মদ শাহেদ সাহেব জীবিত ছিলেন। এক মেয়ের মতো তিনি তার সেবা করেন এবং তার সকল চাহিদার প্রতি যত্নবান ছিলেন। দিবসের যেকোন অংশে তার নিকট পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগমনকারী আতিথিদের তিনি সুন্দরভাবে আতিথেয়তা করতেন। এক ওয়াকফে জিন্দেগীর পুত্রবধূ হওয়ার দায়িত্ব তিনি যথাযথভাবে পালন করেছেন। দরিদ্রদের প্রতি খুবই সদয় ছিলেন আর এক্ষেত্রে তিনি অনেক বেশি উদারহস্ত ছিলেন। এজন্য কখনো কখনো ঋণগ্রস্তও হয়ে পড়তেন। কয়েকবার নিজের গহনা বিক্রি করে দিয়েছেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদা দরিদ্রের সাহায্য করেছেন। নিয়মিত চাঁদা পরিশোধ করতেন আর ওসীয়্যত করেছিলেন। গহনা বিক্রি করেও তিনি তার কোন কোন চাঁদা পরিশোধ করেন। বিভিন্ন তাহরীকের অধীনে নিজের অলঙ্কারাদি দান করেছেন। শুধু নিজেরই নয় বরং তার মরহুম পিতামাতার পক্ষ থেকেও অবশ্যই চাঁদা দিতেন। তিনি অত্যন্ত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, দোয়ায় অভ্যস্ত, রীতিমত নামায ও রোযা পালনকারী এবং তাহাজ্জুদ আদায়কারী নারী ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার ২টি পুত্রসন্তান রয়েছে, তাদেরকেও মরহুমারপুণ্য ধরে রাখার তৌফিক দিন আর সন্তানদের এবং ডাক্তার সাহেবকেও ধৈর্য্য ও মনোবল দান করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ সিরিয়ার শ্রদ্ধেয়া গুসুনুল মাযওয়ানী সাহেবার, যিনি সম্প্রতি তুরস্কে । তিনিও সম্প্রতি ৩৯ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن । দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় মরহুমা ওসীয়্যত করেছিলেন। তুরস্ক জামা'তের প্রেসিডেন্ট এবং মুরব্বী সিলসিলা জনাব সাদেক বাট সাহেব লিখেন, ২০১৫ সালে তিনি সিরিয়া থেকে হিজরত করে তুরস্কে আসেন। ২০১৬ সালে তিনি ইসকান্দারুনের লাজনার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন আর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পূর্ব পর্যন্ত লাজনার প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ ছিলেন এবং শয্যাশায়ী ছিলেন। কিন্তু অসুস্থতা সত্ত্বেও সবসময় তিনি ধর্মের কাজে লেগে থাকতেনান। ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন ফোরামে তবলীগ করতেন। একই সাথে সিরিয়ান আহমদী মহিলাদের তালীম ও তরবিয়্যতের ক্ষেত্রে তিনি গুরুতুপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সবারই প্রিয় মানুষ ছিলেন, সত্যিকার সহানুভূতিশীলা ও সবার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। অনেক মহিলাই আমাকে লিখেছেন আর তারা তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার সাথে ক্ষমা ও অনুগ্রহের আচরণ করুন এবং মর্যাদা উন্নীত করুন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন–

"আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে ইতিহাসে একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে, যদিও তা সাধারণ ইতিহাসবিদদের দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি। কিন্তু আমার এটি ভীষণ পছন্দ। সেটি ওহদের যুদ্ধের ঘটনা, যখন আঁ হযরত (সা.) –এর দাঁত শহীদ হয়। সেই সময় আবু সুফিয়ান বলল, মহম্মদ (সা.) কোথায়? আবু বাকার (রা.) কোথায়? উমর (রা.) কোথায়? অর্থাৎ সকলে নিহত হয়েছে। হযরত উমর (রা.) এই জবাব দিতে উদ্যত হলেন যে,'আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য বেঁচে আছি। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) তাঁকে বাধা দিলেন এবং নিজের জন্য কিছু বলতে দিলেন না। কিন্তু আবু সুফিয়ান যখন বলল 'উলু হুবল, 'উলু হুবল' (হুবলের মর্যাদা উচ্চ হোক, হুবলের মযার্দা উচ্চ হোক)। আঁ হযরত (সা.) তখন আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'তোমরা কেন বলছ না......' আল্লাহু আলা ও আজাল?' অর্থাৎ সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব কেবল আল্লাহ্র জন্যই। বস্তুত তিনি কখনই নিজ সত্তাকে গুরুত্ব দেন নি, নিজের মহত্ব বাসনাও করেন নি, সব সময় চেয়েছেন মানুষকে খোদার সত্তার অনুরাগী করতে। এই ঘটনাগুলির উপস্থিতিতে আমি কখনই মনে করি না যে আঁ হযরত (সা.) পৃথিবীতে নিজের মহত্ব প্রচারের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন।'

(আল ফযল, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯২৯)

১ম পাতার শেষাংশ

শত্রুতা না করলেই ভাল ছিল, আজ উপকারই পেতাম। আঁ হযরত (সা.)–এর শত্রুতা কেবল বিদ্বেষের কারণে ছিল। আর আঁ হযরত (সা.)–এর অসাধারণ উন্নতি দেখে তাদের সেই বিদ্বেষের সুযোগটুকুই হাত ছাড়া হয়েছে। এই কারণে বার বার তাদের মাথায় নিশ্চয় এই ধারণা তৈরী হয়েছে যে তারা যদি মুসলমান হত

অনুরূপভাবে যখন তারা বদরের প্রান্তরে নিহত হচ্ছিল, তখন তাদের মন নিশ্চয় চাইছিল যদি তারা মুসলমান হত।

মোটকথা ইসলামের বিজয়সমূহ শত্রুদের মনে হয়তো এই বাসনার জন্ম দিয়েছিল যে যদি তারাও সঙ্গে থাকত! 'মুনাফিক'–দের উক্তি কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাফেরদেরও হয়তো এই একই অবস্থা হত। এটি স্বাভাবিক বিষয়, কেউ তা অস্বীকার করতে পারে না।

আমার মতে এগুলি ছাড়াও আয়াতটির আরও অর্থ আছে। তফসীরকারকগণ সাধারণত বাহ্যিক সৌন্দর্য, বাগ্মিতা, রচনার উৎকর্ষ এবং মোজেজার বিষয়ে আলোচনা করে, কুরআন করীমের শিক্ষার সৌন্দর্য নিয়ে খুব শব্দ খরচ করে। আমার মতে যে প্রধান বিষয়টি নিয়ে কুরআন করীম অবতীর্ণ হয়েছে সেটি হল এর পরিপূর্ণ ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষা। এদিকেই 'তিলকা আয়াতুল কিতাব' আয়াতটি ইঙ্গিত করেছে। আর আয়াতে শিক্ষার এই সৌন্দর্যের প্রতি ঈর্ষার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ইসলামের শিক্ষামালার সৌন্দর্য অবলোকন করে কাফেররা মাঝে মাঝে বলে ওঠে এবং বলে উঠবে, 'আমরাও যদি মুসলমান হতাম, আর এটা সব সময় হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও হতে থাকবে।

হযরত উমর (রা.) কে একজন ইহুদী বলেছিল, কুরআন মজীদে একটি আয়াত আছে, যদি সেটি আমাদের ধর্মগ্রন্থে অবতীর্ণ হত তবে আমরা সেদিন ঈদ উদযাপন করতাম। হযরত উমর (রা.) বললেন, 'সেটি কোন আয়াত?' সেই ইহুদী উত্তর দিল, 'আল ইয়াওমু আকমালতু লাকুম দ্বীনাকুম' আয়াতটি। হযরত উমর (রা.) উত্তর দিলেন, 'সেই দিনটি আমাদের জন্য দুটি ঈদের সমাবেশ ছিল। অর্থাৎ জুমার দিন তথা আরাফার দিন আয়াতটি নাযেল হয়েছিল। অনুরূপভাবে জনৈক ইহুদী বলেছিল, 'আপনাদের শরীয়তে একটি বিষয় দেখে আমি অভিভূত হই, জীবনের কোন অংশ এমন নেই যে বিষয়ে এটি আলোকপাত করে নি। এটিই সেই বাসনা হয়তো যা হাজার হাজার অন্তরে সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু তা দু–একজনের মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছে আর কুরআন করীম বলেছে, 'এই যুগেও তালাক, মদ, উত্তরাধিকার বণ্টন এবং আরও অনেক বিষয় আছে যেগুলি নিয়ে জগতবাসী ঈর্ষা করছে। যখন একজন ইউরোপবাসীর মনে এই বাসনার উদ্রেক হয় যে তাদের সমাজেও তালাকের আইন তৈরী হওয়া উচিত, তখন তারা যেন মুসলমান হওয়ার সুপ্ত বাসনাকেই ব্যক্ত করছে। অনুরূপভাবে একজন আমেরিকান বাসীর মনেও এই ইচ্ছে জাগে যে তাদের ধর্মে মদ্যপান নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ভিন্ন বাক্যে তারা رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْن আয়াতের সত্যায়ন করছে। সম্প্রতি ভারতের রাজ্যসভার এক হিন্দু সদস্য বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আইনি খসড়া পেশ করেছিলেন। তিনি নিজের ভাষণের

রিপোর্ট: কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ,

জুলাই মাসের ৭ তারিখ রোজ বুধবার সন্ধ্যা ৬:৪৫টায় থেকে রাত্রি ৮:১০টা পর্যন্ত কান্দি জোন মুর্শিদাবাদের তরফে একটি অনলাইন তরবিয়তী ইজলাস আয়োজিত হয়।

জনাব আশরাফুল শেখ সাহেব আমীর জেলা মুর্শিদাবাদ, কান্দি জোনের সভাপতিত্বে আজিজম ফারাসত মণ্ডল এর কোরআন তেলাওয়াতের সাথে অনুষ্ঠান শুরু হয়। এরপর জামেয় আহমদীয়ার ছাত্র জনাব হুমায়ুন কবীর সাহেব একটি সুন্দর নজম পরিবেশন করেন।

প্রথম বক্তব্য জেলা নাযিম আমির সেখ এবং দ্বিতীয় বক্তব্য জেলা কায়েদ জনাব ওয়াসিম আহমদ এর পর খাকসার কিছু বলার সুযোগ পায়। এরপর জনাব এডিশিনাল নাযির সাহেব ইসলাহ ও ইরশাদ জুনুবী হিন্দ –এর প্রেরিত বার্তা সহ নিজ বক্তব্য রাখেন জনাব কাযি তারিক আহমদ সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ।

পরিশেষে সভাপতির সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং দোয়ার মাধ্যমে ইজলাসের সমাপ্তি ঘটে। সর্বমোট হাজির সংখ্যা ছিল ৯৯জন।

সংবাদদাতা: আব্দুর রউফ, সেক্রেটারী প্রকাশনা বিভাগ,
কান্দি জোন, মুর্শিদাবাদ

দেয় তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যান। আর যাইহোক আমরা লড়াই-ঝগড়া করব না। কিন্তু আমাদের যে অবস্থান ও মৌলিক শিক্ষা রয়েছে, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল যে আদেশ দিয়েছেন তা থেকে আমরা কখনও পিছপা হব না। কেবল একটি সংবাদ মাধ্যম কেন সমস্ত পত্র-পত্রিকা আমাদের বিরুদ্ধে কলামের পর কলাম লেখা আরম্ভ করলেও আপনারা নিজেদের অবস্থানে অবিচল থাকবেন। এ নিয়ে মোটেই উদ্বিগ্ন হবেন না। আর এ বিষয়ে উৎকণ্ঠিত হওয়ার দরকারও নেই যে যদি আমরা তাদের কথা মানি তবে হয়তো আমরা জামাতে আহমদীয়ার বাণী পৌঁছাতে পারব না। ইসলামের বাণী যে করে হোক অবশ্যই পৌঁছাবে। এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে ইলহামের মাধ্যমে বলেছিলেন- "আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিব।" স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা যখন এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন তখন আমাদের বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন কি? আল্লাহ্ তা"লা কুরআন করীমেও বলেছেন, " আমি এবং আমার রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব।" এত সব প্রতিশ্রুতি থাকার পরও আমাদের প্রচার হয়তো পৌঁছাবে না , এমন ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। আর এটি বিজ্ঞতা নয় বরং কাপুরুষতা। একজন মুবাল্লিগ বা একজন পদাধিকারের কাছ থেকে এমন কাপুরুষতাপূর্ণ আচরণ যেন প্রকাশ না পায়। একমাত্র তখনই আপনারা যুগ খলীফার সঠিক অর্থে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এছাড়া জামাতের সদস্যদেরকে এই উপলব্ধি তৈরী করতে হবে যে, আপনাদের জ্ঞান কেবল পুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই বরং আপনারা সেই জ্ঞান নিজেদের জীবনেও বাস্তবায়িত করে চলেছেন। আপনারা সেই সকল মৌলবীদের মত নন যারা মেম্বারে দাঁড়িয়ে শুধু ভাষণ দেয়, কিন্তু নিজেদের বেলাতে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের মাপকাঠি বদলে যেতে থাকে। এর বিরপরীতে যেন এমনটি হয় যে, আপনারা যা কিছু বলেন , তা নিজেও করে দেখান। যদি আপনারা জামাতের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন তবে জামাতের সদস্যদের মনে আপনার প্রতি সম্মান কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। কোন জাগতিক তোষামোদ বা বিচক্ষণতার পরিণামে সম্মান বৃদ্ধি পায় না। সম্মান দিয়ে থাকেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা। আর এটি তখনই হবে যখন আপনাদের কথার সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য থাকবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অনুরূপভাবে কর্মক্ষেত্রে কিছু কিছ ব্যবহারিক বিষয় আপনাদের সামনে আসবে। সেক্ষেত্রে আপনারা সব সময় বিচার-বিবেচনা করে এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন যাতে জামাতের উপকার হয়। যেমন খরচ সংক্রান্ত বিষয়ে আপনারা যেমন নিজেও বুঝে শুনে খরচ করবেন তেমনি পদাধিকারীদেরকে সেভাবে খরচ করার জন্য বোঝানোও আপনাদের কাজ। আমরা দরিদ্র জামাত। কয়েকজন মানুষের চাঁদার অর্থে আমাদের ব্যয় নির্বাহ হয়। জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণী দরিদ্র বা তাদেরকে খুব ধনী বলা যায় না। এই কারণে আপনাদের মধ্যে এই চেতনা থাকা দরকার আমাদের যে চাঁদা আসে তার তুলনায় যেন ব্যয় কমপক্ষে হয়। এবং কম খরচে বেশি কাজ করার চেষ্টা করুন। অর্থনীতির একটি নীতি হল সফলতা সেই লাভ করে যে কম খরচে বেশি লাভ করতে পারে। অতএব আপনাদেরকেও একথা সবসময় স্মরণ রাখতে হবে। আমাদের পরিকল্পনা অনেক বড় বড়। এবং ইনশাল্লাহ্ আল্লাহ্ সেগুলিকে পূর্ণ করবেন। কেননা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি আছে। কিন্তু এর জন্য আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে সমস্ত উপায়-উপকরণ দিয়েছেন সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমরা এই বৃহৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করব।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: হযরত মসীহ মওউদ (আ.) জামাতকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, "জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখ।" জামাতের সম্মান ও মহত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখা একজন মুরুব্বী, মুবাল্লেগ, ওয়াকফে যিন্দগী সব থেকে বড় দায়িত্ব। সব সময় যেন আপনাদের কাছে জামাতের সম্মান ও মহত্ব প্রাধান্য পায়। আর এটি তখনই সম্ভব, যেরূপ আমি পূর্বে বলেছি, যখন আপনারা সব সময় নিজেদের উপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখবেন, একদিকে আপনাদের ইবাদতের মান যেমন উন্নত হবে তেমনি নৈতিকতার মানও যেন উচ্চ হয়। প্রত্যেক বিষয়ে আপনারা যেন অনুকরনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হন। যখন বাড়িতে থাকেন তখন আপনার পরিবারের সামনে উন্নত দৃষ্টান্ত তুলে ধরুন। আর আপনি যখন বাড়ির বাইরে আছেন তখন কথাবার্তা ও চাল-চলনে যেন উচ্চ মান বজায় থাকে। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও যেন উন্নত দৃষ্টান্ত থাকে এবং প্রত্যেকে যেন আপনাকে দেখে বলে যে, এরা জামাতের আহমদীয়ার প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে এবং এদের দ্বারা কখনও এমন কোন কাজ সম্পাদিত হয় না যা জামাতের স্বার্থের পরিপন্থী হয়। এরা এমন মানুষ যারা নিজেদের সম্মানকে বাজি রেখে জামাতের সম্মান ও মহত্বকে অক্ষুণ্ন রাখে। অতএব আপনাদেরকে এই মানে উপনীত হতে হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: অতঃপর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, " তোমাদের একটি লক্ষ্য হওয়া থাকা উচিত।" আর সেই লক্ষ্য কি?

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

এটিই সেই লক্ষ্য যা মোটের উপর জামাতের প্রত্যেক সদস্যের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু মুরুব্বীদের জন্য এটি চূড়ান্ত লক্ষ্য। এটি একটি ব্যপক কাজ। যখন আমরা ইইয়া কানাবুদু বলি, তখন আমাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে হবে, যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এটি কেবল কর্তব্য নয় এটি হল চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং জামাতের সম্মান প্রতিষ্ঠিত করার জন্যও। এবং আল্লাহ্ তা'লার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার সামনে নতজানু হওয়া, কখনও কোন মানুষের সামনে মস্তক না নোয়ানো। কোন ব্যক্তির কারণে জাগতিকতার প্রতি প্রলুব্ধ না হওয়া, বরং প্রত্যেকটি বিষয়ে আল্লাহ্র তা'লার কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া। কেননা মানুষ ভুলে ভরা। আর আল্লাহ্ তা'লার কাছে সব সময় এই দোয়া করতে থাকা উচিত যে, اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ আমাকে সহজ -সরল পথে পরিচালিত কর। যাতে আমি এমন কোন প্ররোচনায় পা না দিই যার কারণে জামাতের সম্মান ও মর্যাদার উপর আঘাত আসে, জামাতের মহত্বের উপর আঘাত আসে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বয়আতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এবং মুরুব্বী পদবি গ্রহণ করে তার উপর আঘাত আসে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একজন নিজের কোন অনুচিত কাজের দ্বারা কেবল নিজের সুনাম হানিই করে না বরং সমগ্র জামাতের সুনাম হানির কারণ হয়। অতএব اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ যেন সব সময় আপনাদের দৃষ্টিপটে থাকে এবং এবিষয়ে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করেন। এবং اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ অর্থাৎ ঐ সমস্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার চেষ্টা করুন যাদেরকে আল্লাহ্ তা'লা পুরস্কৃত করেন। অতএব যখন এমন পুরস্কৃতদের অন্তর্ভুক্ত হবেন একমাত্র তখনই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উক্তি অনুসারে আমরা সেই চারটি বিষয়ের উপর আমলকারী হব এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনকারী হব। এই কথাটি সব সময় নিজেদের সামনে রাখা উচিত। আর এই বিষয়গুলির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাকওয়াও যেন থাকে। প্রত্যেক মুরুব্বীর তাকওয়া উচ্চ মানের হওয়া বাঞ্ছনীয়। একজন বুযুর্গের কাপড়ে সামান্য দাগ লেগে ছিল আর সেই দাগ তিনি ধুচ্ছিলেন। তার এক মুরীদ জিজ্ঞাসা করল যে, হুযুর আপনি তো ফতওয়া দিয়ে রেখেছেন যে, এটুকু দাগকে নোঙরা বলা চলে না, এতে নামায ও অন্যান্য ইবাদত করা বৈধ। আপনার কাপড়ও তো পরিস্কার রয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন, আমি যেটি তোমাদেরকে বলেছিলাম সেটি হল ফতোয়া বা নিদান। আর আমি যেটি করছি সেটি হল তাকওয়া। অতএব একজন মুরুব্বীকে ফতোয়া ও তাকওয়ার মধ্যে পার্থক্য রাখার জন্য নিজেদের মানকে সমুন্নত করতে হবে। এবিষয়টি সব সময় স্মরণে রাখবেন। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রাখলে ইনশা আল্লাহ্ তা'লা আপনারা কর্মক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মানের মুবাল্লিগের ভূমিকা পালনকারী হয়ে উঠবেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: আল্লাহ্ করুক আপনারা সকলে আমার কথা গুলি কেবল ডাইরিতেই লিখে না রেখে বরং কর্মক্ষেত্রে গিয়ে এগুলিকে বাস্তবায়িতও করেন এবং একজন দৃষ্টান্ত-স্থানীয় মুবাল্লিগ হয়ে উঠুন। আপনারা যেন সেই বিপ্লব সাধনকারী হয়ে ওঠেন যাদেরকে প্রস্তুত করার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে আল্লাহ্ তা'লা এই যুগে পাঠিয়েছেন এবং আপনারা যেন খিলাফতে আহমদীয়ার যথার্থ বাহুশক্তি হয়ে ওঠেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আমীন।

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে ওয়াকফে নও খুদ্দামদের ক্লাস

সাড়ে এগারোটার সময় হুযুর আনোয়ার (আই.) হলঘরে আসেন যেখানে ওয়াফে নও খুদ্দামদের সঙ্গে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। এরপর সায়াদাত আহমদ সাহেব আরবীতে হাদীস উপস্থাপন করেন। এবং আনসার আফজল সাহেব উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন।

হাদীস:

হযরত সুহেল (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করে যে, হে আল্লাহ্র রসূল! আমাকে এমন কোন কাজ বলুন যা করলে আল্লাহ্ তা'লা আমাকে খুব ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসতে শুরু করবে। তিনি (সা.) বললেন: জগত বিমুখ হয়ে যাও আল্লাহ্ তা'লাও তোমাকে ভালবাসবেন। মানুষের কাছে যা কিছু আছে সেগুলি পাওয়ার বাসনা ত্যাগ কর, তবে মানুষও তোমাকে ভালবাসতে শুরু করবেন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে। (২য় পর্ব)

(মামা ও চাচার সামনে পর্দার বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে খণ্ডাংশ, গত সংখ্যার পর)

খলীফাতুল মসীহ রাবে এর মাধ্যমে একথাই বুঝিয়েছেন যে, চাচা ও মামারা একই পরিবারের সদস্য নন, তারা বাইরের মানুষ। যদিও তাদেরকে মাহাররাম আত্মীয়ের মধ্যেই রাখা হয়েছে, কিন্তু যখন তারা বাড়িতে আসেন, তখন মেয়েরা যেভাবে সেই বাড়িতেই এক সঙ্গে থাকা নিজের স্বামী, বাবা, ছেলেদের সামনে পর্দার বিষয়ে তুলনামূলক খোলামেলা অবস্থায় থাকে, বাইরে থেকে আসা মাহাররাম পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদেরকে কিছুটা বেশি সতর্কতা থাকা উচিত। যদিও তাদের সামনে মুখ ঢেকে রাখা হয় না, কিন্তু মাথা এবং বুক ঢেকে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে তাদের সামনে বসার নির্দেশ রয়েছে। হুযুর (রহ.) এই বিষয়টিই এখানে বর্ণনা করেছেন, চাচা ও মামাদের সামনে পর্দা করার নির্দেশ দিচ্ছেন না।

প্রশ্নঃ হুযুর আনোয়ার (আই.) প্রদত্ত একটি খুতবায় একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল এই যে, আঁ হযরত (সা.) হযরত কাতাদা বিন নুমানকে একটি লাঠি উপহার দিয়ে বলেছিলেন, 'এর দ্বারা নিজের বাড়িতে থাকা জিন মেরে তাড়িয়ে দিও।' এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারকে চিঠি লিখে ঘটনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে আবেদন করেছেন। যার উত্তরে হুযুর আনোয়ার ২০১৯ সালের ২৯ শে আগস্ট তারিখের চিঠিতে লেখেন-

হুযুর (সা.)-এর হাদীস এবং অন্য একটি হাদীসে যেখানে হুযুর (সা.) কিম্বা তাঁর সাহাবার জন্য আলো ছড়ানোর ঘটনার উল্লেখ আছে, বস্তুত এই হাদীস দুটিতে আঁ হযরত (সা.)-এ মোজেজার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এই ধরণের মোজেজা আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক যুগে তাঁর নবীদের সত্যতা প্রমাণের জন্য প্রকাশ করে এসেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর পূর্বের নবীদের জীবনেও এমন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় আর হুযুর (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাস হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার সপক্ষেও আল্লাহ তা'লা এমন একাধিক ঘটনা প্রকাশ করেছেন।

জিন বা শয়তানকে লাঠি দিয়ে প্রহার করার যে প্রসঙ্গটি এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এবং এর দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে জিন মানুষের দেহে প্রবেশ করে আর এভাবে লাঠি দিয়ে প্রহার করে জিনদের মানবদেহ থেকে বের করা যায়। এটা একেবারেই বাজে কথা।

এই হাদীসে জিন বলতে কোন চোর কিম্বা ক্ষতিকারক কোন জন্তুকে বোঝানো হয়েছে যারা রাতের অন্ধকারে হযরত কাতাদা বিন নুমানের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লার রীতি, তিনি স্বীয় নবীদেরকে অসাধারণভাবে অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কে অবগত করেন। এখানেনও আল্লাহ্ তা'লা হুযুর (সা.) কে আগে থেকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে হযরত কাতাদা বিন নুমানের বাড়িতে কোন চোর বা ক্ষতিকর জন্তু লুকিয়ে আছে। এই কারণে হুযুর (সা.) হযরত কাতাদা বিন নুমানকে এই বিপদ সম্পর্কে অবগত করার পর তাকে এই উপদেশ দান করেন যে, বাড়িতে পৌঁছে এই লাঠি দিয়ে সেই চোর বা জন্তুটিকে মেরে তাড়িয়ে দিও।কতিপয় অন্য পুস্তকে এই ঘটনার ব্যাখ্যায় একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, কাতাদা বিন বিন নুমান যখন বাড়ি পৌঁছন, তখন সকলে ঘুমিয়ে পড়েছিল আর বাড়ির এক কোনে একটি কালো রঙের বস্তু লুকিয়ে ছিল, যাকে তিনি সেই লাঠি দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেন।

প্রশ্নঃ এক ভদ্রলোক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, ব্যবসা বাণিজ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা অর্জনের জন্য এবং দুর্ঘটনায় হওয়া ক্ষতির হাত থেকে বাঁচতে বীমাকরণ সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশ কি?

২০১৬ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে লেখা চিঠিতে হুযুর আনোয়ার এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন-

একমাত্র সেই সব বীমা বৈধ যার থেকে পাওয়া অর্থে লাভ ও ক্ষতিতে অংশীদার হওয়ার শর্ত থাকে, জুয়োর রূপ থাকে না। কেবল যদি লাভের শর্তে অংশীদারী পাওয়া যায়, তবে তা সূদ হওয়ার কারণে অবৈধ।

অনুরূপভাবে যদি পলিসি হোল্ডার কোম্পানির সঙ্গে এমন চুক্তি করে নেয় যে, সে শুধুমাত্র সঞ্চিত অর্থ নিবে, সুদ নিবে না, তবে এমন বীমা করাতেও কোন অসুবিধা নেই।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইনসিউরেন্স প্রসঙ্গে বলেছেন-সুদ এবং জুয়োকে পৃথক করে অন্যান্য চুক্তি এবং দায়িত্বকে শরিয়ত সঠিক বলে আখ্যায়িত করেছে। জুয়োর মধ্যে দায়িত্ব থাকে না। জাগতিক ব্যবসা বাণিজ্যে দায়িত্বের প্রয়োজন আছে। "

(বদর পত্রিকা, ১০নং, ২য় খণ্ড, পৃ:৭৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) তাঁর এক বক্তৃতায় বলেন- 'যদি কোন কোম্পানি শর্ত রাখে যে, বীমা গ্রহণকারী কোম্পানির লাভ ও ক্ষতি উভয়ের শরিক হবে, তবে বীমা করানো বৈধ হতে পারে।

(আল ফযল, ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩০)

একটি চিঠির উত্তরে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লেখেন, আমরা সুদের সংমিশ্রনের কারণে ইনসিওরেন্সকে অবৈধ বলি, এমন কথা সঠিক নয়। অন্তত আমি তো এটিকে এই কারণে অবৈধ বলি না। এর অবৈধ হওয়ার অনেকগুলি কারণ আছে, যার মধ্যে একটি হল, ইনসিওরেন্স ব্যবসার ভিত্তি টিকে আছে সুদের উপর। আর কোন ব্যবসার ভিত্তি সুদের উপর হওয়া এবং কোন বিষয়ে সুদের সংমিশ্রন হওয়ার মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। সরকারের আইন অনুসারে কোনও ইনসিওরেন্স কোম্পানি দেশে চালু হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সরকার এক লক্ষ (টাকার) সিকিউরিটি না কেনে। কাজেই এখানে সংমিশ্রনের প্রশ্ন নেই, আবশ্যিকতার প্রশ্ন।

২) দ্বিতীয়ত, ইনসিওরেন্সের নীতি হল সুদ। কেননা, ইসলামী শরিয়ত অনুসারে ইসলামের নীতি হল কেউ যখন কাউকে কোন অর্থ দেয় তা উপহার, আমানত, অংশ কিম্বা ঋণ হতে পারে। এটি উপহার অবশ্যই নয়, আমানতও নয়, কেননা আমানতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। এটি অংশও নয়, কেননা কোম্পানীর লাভ লোকসানের দায়িত্ব এবং পরিচালনার ক্ষেত্রে পলিসি হোল্ডার শরিক নয়। আমরা এটিকে ঋণ হিসেবেই গণ্য করব, আর বাস্তবেও তা ঋণই বটে। কেননা এই টাকাকে ইনসিওরেন্স কোম্পানি নিজেদের ইচ্ছে ও অধিকার বলে কাজে লাগায় আর ইনসিওরেন্সের কাজে লোকসান হলে তার দায় অর্থপ্রদানকারীদের উপর তারা চাপায় না। অতএব, এটি এক প্রকার ঋণ, আর যে ঋণের পরিবর্তে পূর্ব নির্ধারিত চুক্তি অনুসারে লাভ অর্জিত হয়, ইসলামী শরিররয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটিকে ইসলামী সুদ বলা হয়। কাজেই সুদের উপরই ইনসিওরেন্সের ভিত্তি দাঁড়িয়ে আছে।

৩) তৃতীয়ত, যে সব নীতির উপর ইসলাম সমাজের ভিত্তি রাখতে চায়, বীমার নীতি সেগুলি প্রত্যাখ্যান করে। ইনসিওরেন্সকে পুরোপুরি প্রচলিত করার পর পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা পৃথিবীকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হত।"

(আলফযল কাদিয়ান, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪)

কিছু কিছু দেশে সরকারি আইন অনুযায়ী বিমা করানো বাধ্যতামূলক। এমন বীমা করানো বৈধ। ১৯৪২ সালের ২৫ শে জুন হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) কে জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন যে,যার কাছে গাড়ি আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিকে ইউপি সরকার তার বীমা করানো নির্দেশ দিয়েছে। এটা কি বৈধ?

হুযুর (রা.) বলেন: 'এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, এই নির্দেশ শুধু ইউপি সরকারের নয়, পাঞ্জাবেও সরকার এই একই নির্দেশ দিয়ে রেখেছে। এই বীমা যেহেতু আইন অনুসারে করা হয়, সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলক, তাই নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নয়, সরকারের আনুগত্যের কারণে এটি বৈধ।"

(আল ফযল, ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৬১)

ইনসিওরেন্সের বিষয়ে ইফতা কমিটি হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ)-এর সমীপে নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করে, ১৯৮০ সালের ২৩ শে জুন তিনি যেগুলির মঞ্জুরী প্রদান করেন। "হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) এর ফতোয়া অনুসারে যতক্ষণ চুক্তি সুদ ও জুয়া থেকে মুক্ত না হবে, বীমা কোম্পানিগুলি থেকে কোন ধরণের বীমা করানো বৈধ নয়। এই ফতোয়া স্থায়ী এবং অপরিবর্তনীয়। তবে বিভিন্ন সময়ে এ বিষয়ে যাচাই করে দেখা যেতে পারে যে বীমা কোম্পানিগুলি নিজেদের পরিবর্তিত আইন ও নিয়মের পরিণামে জুয়া ও সুদের বৈশিষ্ট্য থেকে কতটা মুক্ত হয়েছে।

মজলিসে ইফতা এই দৃষ্টিকোণ থেকে বীমা কোম্পানিগুলির বর্তমান পদ্ধতি বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, যদিও প্রচলিত বৈশ্বিক আর্থিক ব্যবস্থাপনার কারণে কোন কোম্পানির পক্ষেই নিজের ব্যবসায় সুদকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়, কিন্তু বর্তমানে কোম্পানি এবং পলিসি হোল্ডারের মাঝে এমন চুক্তি হওয়া সম্ভব যা সুদ ও জুয়ার ছোঁয়াচ মুক্ত। অতএব, বীমা কোম্পানির কাছে সঞ্চিত অর্থের কোন সুদ গ্রহণ না করার শর্তে বীমা করানোয় কোন অসুবিধে নেই। "

(নথিভুক্ত সিদ্ধান্ত, মজলিসে ইফতা, পৃ: ৬০, অপ্রকাশিত)

প্রশ্নঃ নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া রাবোয়া হাদীসের পুস্তকে বর্ণিত পুত্রের জন্য পিতার দোয়া এবং পুত্রের বিরুদ্ধে অভিশাপ উভয় কবুল হওয়ার বিষয়ে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর নিকট হাদীস এবং বিভিন্ন অভিধান থেকে এর আরবী শব্দগুলির ব্যাখ্যা উপস্থাপন করার পর এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা চেয়ে পাঠিয়েছে যে এগুলির মধ্যে কোন হাদীসটি এবং কোন অনুবাদটি গ্রহণ করা উচিত?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৫সালের ২৫ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন- 'যদি 'পুত্রের জন্য পিতার দোয়া' অনুবাদ করা যায়, তবে হাদীসে অনুবাদ স্পষ্ট হবে। কিন্তু হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত উভয় প্রকারের হাদীস নিজ নিজ স্থানে

সঠিক আর তা আমাদের পথপ্রদর্শন করছে। উভয় হাদীসকে সামনে রাখলে বিষয়টি যা দাঁড়াবে তা হল, যে ব্যক্তির দোয়ার গ্রহণীয়তার মর্যাদা রাখে, তার বদদোয়া বা অভিশাপও গ্রহণ হতে পারে। আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেন যে দোয়া কবুল করব, কিন্তু বদ দোয়া কবুল করব না।

পিতাকে আল্লাহ্ তা'লা যে মর্যাদা দান করেছেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্ তা'লা তার দোয়া গ্রহণ করে থাকেন আর বদদোয়াও শোনেন। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا○وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِيْ صَغِيْرًا ○

(অনুবাদ: এবং তোমার প্রতিপালক তাকীদপূর্ণ এই আদেশ দিয়াছেন যে, তোমরা তাঁহাকে ছাড়া আর কাহারও ইবাদত করিও না এবং পিতামাতার সহিত সদ্ব্যবহার করিও। যদি তাহাদের একজন বা উভয়ই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তাহা হইলে, তাহাদের উভয়কে তুমি 'উফ' পর্যন্ত বলিও না এবং তাহাদিগকে ধমক দিও না, বরং তাহাদের সহিত সম্মানসূচক ও মমতাপূর্ণ কথা বলিও। তুমি করুণাভরে তাহাদের উপর বিনয়ের বাহু অবনত রাখিও এবং বলিও, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাহাদের উভয়ের প্রতি সেইভাবে রহম কর যেভাবে তাহারা আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করিয়াছিল।')

(বনী ইসরাইল: ২৪–২৫)

কাজেই এই হাদীসে আঁ হযরত (সা.) আমাদেরকে এই উপদেশ দিয়েছেন যে, পিতার দোয়ায় কল্যাণমণ্ডিত হও এবং তার অভিশাপ থেকে বেঁচে চল।

প্রশ্ন: গুলশানে ওয়াকফে নও লাজনা ও নাসেরাত মেলবর্ণ অস্ট্রেলিয়া

২০১৩ সালের ১২ অক্টোবর তারিখের অনুষ্ঠানে একটি মেয়ে হুযুর আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে, আল্লাহ্ তা'লাকে আমরা দেখতে পাই না কেন? এর উত্তরে হুযুর বলেন–

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লা এমন এক সত্তা যাঁকে দেখা যায় না। (হুযুর আনোয়ার প্রশ্নকারী মেয়েটিকে ছাদে লাগানো বাল্বের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন) তুমি এই বাল্বটি দেখতে পাচ্ছ তো? আর বাল্বের আলো (হুযুর তাঁর সামনে থাকা টেবিলের দিকে দেখিয়ে বললেন) এখানে পড়তে দেখছি। এই আলো এখানে কিভাবে আসছে? আলোকে কি তুমি আসতে দেখতে পাচ্ছ? (হুযুর আনোয়ার পুনরায় মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করেন) সেটি বাল্বের আলো, সেখানে ওটা জ্বলজ্বল করছে আর এখানে (টেবিলের উপর) আলো এসে পড়ছে। কিন্তু মাঝের যে যে দূরত্ব আছে সেখানেও তো কোন বস্তু চোখে পড়া উচিত। সেখান থেকে শুরু করে এখানে পৌঁছে গেল, কিন্তু মাঝে কিছু দেখা যাচ্ছে কি? (মেয়েটি উত্তর দিল, দেখা যাচ্ছে না। হুযুর বললেন) দেখা যাচ্ছে না, তাই তো? আল্লাহ্ তা'লা এর থেকেও বেশি উজ্জ্বল আর তাঁর জ্যোতি এমন যা দেখা যায় না। তবে আল্লাহ্ তা'লার শক্তিসমূহ প্রত্যক্ষ করা যায়। তুমি দোয়া কর, তোমার দোয়া কখনও কবুল হয়েছে? তুমি আল্লাহ্ তা'লার কাছে কখনও দোয়া করেছ? সেই দোয়া কি পূর্ণ হয়েছে? (মেয়েটি উত্তর দিল, জ্বি, পূর্ণ হয়েছে। হুযুর বলেন) এটিই আল্লাহকে দেখা। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, পৃথিবী, গ্রহ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এবং এই পৃথিবীর জীবজন্তু, গাছপালা, বনস্পতি– অস্ট্রেলিয়ার 'ফ্লোরা এ্যান্ড ফউনা' বেশ প্রসিদ্ধ স্থান হিসেবে পরিচিত– এই সব কিছু আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে দেখ। এমনিতে বলা হয় যে গাছের পাতায় যে ক্লোরোফিল থাকে, তা থেকেই গাছের। আর পাতাই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আমি এখানে এমন গাছও দেখেছি যা একটি কাঠির মত, কাঠির মত সেই কাণ্ডটিই পাতার ভূমিকা পালন করে আর তার মাথায় সুন্দর রঙীন ফুল ফুটে আছে। এটিও আল্লাহ্‌র তা'লার মহিমা। আল্লাহ্‌র সৃষ্ট প্রত্যেক জিনিসকে দেখ এবং চিন্তা কর, সেখানেই আল্লাহকে দেখা যায়।

প্রশ্ন: একজন লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করে যে, ওয়াকফে নও লাজনার যখন বিয়ে হয় আর আর আমাদের উপর সংসার ও সন্তানের লালন পালনের দায়িত্ব এসে পড়ে, সেই সময় আমরা নিজেদের ওয়াকফে নও হওয়ার ভূমিকা কিভাবে পালন করব?

হুযুর আনোয়ার বলেন–ওয়াকফে নও হওয়ার ভূমিকা সঠিকভাবে পালন করতে গেলে প্রথমে পাঁচটি ফরয নামায ভালভাবে পড়, তাহাজ্জুদ পড়তে পারলে তাহাজ্জুদ পড়। কুরআন শরীফ পড় আর এর অনুবাদ পড়। লাজনা বিভাগের কোন কাজ যদি তোমাদের দায়িত্বে থাকে, তবে যতদূর সম্ভব তা পালন কর। আর সব থেকে বড় দায়িত্ব হল সন্তানের লালন পালন এমনভাবে কর যাতে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তুমি যে ওয়াকফে নও তা স্বামী যেন তোমার নিজের, পরিবারে এবং সন্তানদের লালন পালন করা দেখে অনুভব করে। আর স্বামীকে এই কাজে নিজের সঙ্গী করে নাও। কেননা পিতা যদি নিজের ভূমিকা পালন না করে,তবে সন্তানদের সঠিক লালন পালন হয় না। অতএব সব থেকে বড় দায়িত্ব সংসারের দায়িত্ব সামলানো। আর এটিই তোমাদের জন সব থেকে বড় পুণ্যের কাজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক মহিলা আঁ হযরত (সা.)–এর নিকট এসে বলল, 'আমার স্বামীরা জিহাদেও যায়, উপার্জন করে, চাঁদাও দেয় আর বাইরে অনেক কাজ করে যা আমরা মেয়েরা করতে পারি না। তাই এই জিহাদ এবং চাঁদা দেওয়ার পুণ্য আমরাও কি পাব? আঁ হযরত (সা.) বললেন, হ্যাঁ, কেননা তোমরা তাদের পরিবারের ভালভাবে দেখাশোনা কর, তাদের সন্তানদের লালন পালন কর, বাড়িতে তাদের অনুপস্থিতিতে ঘর সামলাও। আর এর ফলে যে এক পুণ্যবানদের একটি প্রজন্ম তৈরী হচ্ছে, তার কারণে তোমরাও এর থেকে পুণ্য লাভ করবে। এছাড়াও নিজেদের স্বামীদেরকে ধর্মের সেবার্থেও পাঠাচ্ছ। তোমাদের স্বামীরা যদি জাগতিক কাজ কর্ম করে, ধর্ম সেবা যদি নাও করে, তবুও এই হাদীসে বর্ণিত হয়েছে মেয়েরা হল পরিবারের তত্ত্বধায়ক। অতএব, ওয়াকফে নওদের দায়িত্ব হল নিজেদের নতুন প্রজন্মকে আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা।

৭ অক্টোবর, ২০১৩ –এর ক্লাসে একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, লোকেরা ইসলাম এবং সন্ত্রাসবাদকে একত্রে কেন মেশায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন:

উত্তর– এই জন্য যে, বর্তমানে যতগুলি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আছে যেমন– আল কায়েদা, তালিবান, বোকো হারাম এবং অন্যান্য নিত্যনতুন যে সব সংগঠন আত্মপ্রকাশ করছে,তাদের মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমানেরা। তাই লোকেরা মনে করে ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদ হয়তো একই বিষয়। এই বিভ্রান্তিকেই তো আমাদের দূর করতে হবে। এই জন্যই এখানে বুকস্টলে পাথ ওয়ে টু পিস নামে একটি বই পড়ে আছে যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে দেওয়া আমার বিভিন্ন বক্তব্য, যার দ্বারা আমি একথা তুলে ধরেছি যে, ইসলাম এবং সন্ত্রাসকে গুলিয়ে ফেলো না, দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। এই কাজগুলি তাদের কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই বইটি পড় (হুযুর আনোয়ার বইটির মূল্য প্রসঙ্গে বলেন, এখানে বেশি দামে বিক্রি করছে বলে মনে হচ্ছে, তাদেরকে দুই ডলারে বিক্রি করা উচিত, শুনলাম পাঁচ ডলারে বিক্রি করছে,ওয়াকফে নওদেরকে তো দুই ডলারেই দেওয়া উচিত)। এই বইটি কিনে নিয়ে পড়। এতে তোমরা আমার লেখা সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। ইসলামের শিক্ষা অপূর্ব সুন্দর, ইসলাম কখনও নিজে থেকে যুদ্ধ করে নি, আর কখনও সন্ত্রাসও চালায় নি। এমনকি মক্কা বিজয়ের সময়ও আঁ হযরত (সা.) সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। কুরআন করীম অত্যাচার করতে নিষেধ করেছে। কুরআন শিক্ষা দেয়, কাউকে অকারণে হত্যা করো না। কাউকে হত্যা করার অর্থ সমগ্র মানবতাকে হত্যা করা। আর এই মুসলমানেরা কাদেরকে হত্যা করছে? খৃষ্টানদেরকে তো বেশি হত্যা করছে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকেই তো হত্যা করছে। পাকিস্তানে যে প্রতিদিন আক্রমণ হয় বা ইরাকে শিয়াদেরকে হত্যা করা হয় বা শিয়ারা সুন্নীদেরকে হত্যা করে বা সর্বত্র আত্মঘাতী বিস্ফোরণ হচ্ছে, সেখানে মুসলমানেরাই মরছে। চার্চের উপর সম্প্রতি হামলা হয়েছে যেখানে চার্চের মধ্যে প্রায় দুশো খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষ মারা গেছে। কিন্তু অন্যান্য সমস্ত স্থানে তারা মুসলমানদেরকেই হত্যা করছে। আমাদেরকে, আহমদীদেরকে হত্যা করছে। কিম্বা অন্যান্য স্থানে যে সব বোমা বিস্ফোরণ হতেথাকে, সেখানেও মুসলমানেরাই মারা যায়। অতএব, এরা সকলে সন্ত্রাসী, নিজেরাই একে অপরকে হত্যা করছে। যার অনুমতি কোথাও দেওয়া হয় নি। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন, তোমরা একে অপরের প্রতি অনেক বেশি দয়া কর। আর এরা মুসলমানদেরকেই হ ত্যা করছে। আর একজন মুসলমানকে অকারণে হত্যা করার অপরাধে আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন। তাই এরা সব জাহান্নামী হচ্ছে। কাজেই ইসলাম এবং সন্ত্রাসের মাঝে কোন সম্পর্ক নেই। এই শব্দটিকে দেখ, ইসলামের অর্থ হল শান্তি। তোমরা যদি এম.টি.এ শোন, আর ওয়াকফীনে নওদের তো অবশ্যই শোনা উচিত। যুক্তরাজ্যের জলসায় আমার যে শেষ বক্তব্যটি ছিল, তার এ বিষয়ের উপরই ছিল অর্থাৎ ইসলাম কি আর মুসলমান কি? আর এই বইটি কিনে পড়ে নাও, এটিতো ইংরেজিতে আছে, তোমরা পড়তে পারবে।

প্রশ্ন: জনৈক আহমদী হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর নিকট কয়েকটি হাদীস উপস্থাপন করেন যাতে পুরুষদেরকে লোহ আংটি পরতে নিষেধ করা হয়েছে। অতঃপর তিনি এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার (আই.)–এর দিক–নির্দেশনা চেয়েছেন আর এ প্রসঙ্গে যুবকদের ফ্যাশন হিসেবে হাতে লোহার কড়া পরার বিষয়ে উল্লেখ করেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখের চিঠিতে লেখেন–

'আমি এই বিষয়ে গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। আপনার পাঠানো হাদীসগুলি সুনান আবু দাউদ এ বর্ণিত হয়েছে। সহীহ বুখারীতেও কিছু হাদীস পাওয়া যায় যেখানে এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, হুযুর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 19 Aug, 2021 Issue No.33

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

(সা.) এক সাহাবীকে হক মোহর হিসেবে লোহার আংটি দিয়ে নিকাহ করার কথা বলেছেন। অনুরূপভাবে সুনান দাউদে এই হাদীসও রয়েছে যে হুযুর (সা.)=এর নিজের আংটিটি লোহার ছিল, যার উপর রুপো জড়ানো ছিল।

উপরোক্ত হাদীসগুলির ব্যাখ্যায় হাদীস বিশারদগণ একথাও লিখেছেন , যে হাদীসে লেখা আছে যে লোহার আংটি অপছন্দীয় সেটি দুর্বল হাদীস। তারা একথাও লিখেছেন যে যদি লোহার আংটি পরা অবৈধ হত তবে যেভাবে হুযুর (সা.) পুরুষদেরকে সোনার আংটি পরতে নিষেধ করেছেন, ঠিক সেভাবেই লোহার আংটি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়েও স্পষ্ট নির্দেশ দিতেন।

তবে যুবকদের হাতে কড়া বা এই ধরণের জিনিস পরা এমনিতেও অপছন্দনীয় কাজ। তাই আপনি এ বিষয়ে ছেলেদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে এর উত্তম প্রতিদান দিন। আমীন।

প্রশ্ন: একজন মুরুব্বী সাহেব হুযুর আনোয়ারকে পত্রে লেখেন, 'ঈদের সময় কিছু মানুষ মসজিদে এসে ঈদের পূর্বে বা পরে নফল নামায পড়ে। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের দিক নির্দেশনা পাওয়ার আবেদন করছি।

হুযুর আনোয়ার ২০১৭ সালে ১৪ই অক্টোবর তারিখে লেখা চিঠিতে মুরুব্বী সাহেবকে যে উত্তর দেন এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থাপনাকে যে নির্দেশ প্রদানকরেনন তা দেওয়া হল। হুযুর লেখেন–

'ঈদের নামাযের পূর্বে নফল নামায পড়া নিষিদ্ধ।যেমনটি হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত। কিন্তু পরে যদি নিষিদ্ধ সময় শুরু না হয়ে যায় তবে বাড়িতে গিয়ে নফল পড়া যেতে পারে। এতে কোন অসুবিধে নেই।

আমি জেনারেল সেক্রেটারী সাহেবকেও এই নির্দেশ দিয়েছি যে, যারা ঈদের দিন ঈদের নামাযের পূর্বে মসজিদে এসে নফল পড়তে আরম্ভ করে দেয়, তাদেরকে এটি নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে নামাযের পূর্বে যেন মসজিদে যথারীতি ঘোষণা করানো হয়।

প্রশ্ন: একভদ্রলোক ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়া, নামাযে ইমামের কোন রাকাতে তকবীর ভুলে যাওয়া এবং তা বুঝতে পেরে সিজদা সহু করার বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের নিকট দিক–নির্দেশনা দেওয়ার আবেদন করেন।

হুযুর আনোয়ার ২০১৭ সালের ২১ নভেম্বর তারিখে লেখা চিঠিতে বলেছেন, 'ঈদের নামায হল 'সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ' (এমন সুন্নত যার বিষয়ে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে) হুযুর (সা.) ঋতুবতী মহিলাদেরকে, যাদের জন্য নামায ফরয নয়, তাদেরকেও ঈদগাহে এসে মুসলমানদের দোয়া অংশগ্রহণ করতে জোর দিয়েছেন। আর যতদূর ইমামের তকবীর ভুলে যাওয়ার বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে নামাযীরা স্মরণ করিয়ে দিবে, স্মরণ করানোর পরেও যদি ইমাম কিছু তকবীর উচ্চারণ না করে,তবু মুকতাদিরা ইমামের অনুসরণেই ঈদের নামায পড়বে। তকবীর ভুল হলে সিজদা সহু করার প্রয়োজন নেই। (ক্রমশ.....)

(রিপোর্ট.... ৯ পাতার পর..)

(ইবনে মাজা, বাবুয যোহদ)

এরপর ইমরান যাকা সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর মালফুযাত পেশ করেন।

মালফুযাত

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: " খোদার বান্দা কারা। এরা সেই সমস্ত মানুষ যারা খোদা তা'লা প্রদত্ত জীবনকে আল্লাহ্ তা'লার পথে উৎসর্গ করাকে এবং নিজের ধন–সম্পদকে তাঁরই পথে ব্যয় করাকে খোদার কৃপা ও অনুগ্রহ জ্ঞান করে। কিন্তু যারা জাগতিক ধন–সম্পদকেই নিজেদের উদ্দেশ্য ও বিধেয় বানিয়ে নেয় তারা অবহেলার দৃষ্টিতে ধর্মকে দেখে থাকে। কিন্তু প্রকৃত মুমিনের এটি কাজ নয়। প্রকৃত ইসলাম হল, আল্লাহ্ তা'লার পথে নিজের যাবতীয় শক্তি–সামর্থ্য আজীবন উৎসর্গ করতে থাকা যাতে সে পবিত্র জীবনের উত্তরাধিকারী হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এই পথে উৎসর্গীকরণের বিষয়ে বলেন: (আল–বাকারা: ১১৩) এখানে আসালামা ওয়াজহাহুর অর্থ এটিই যে, আত্ম–বিলীনতা ও বিনম্রতার পোশাক পরিধান করে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসা এবং নিজের জীবন, ধন–সম্পদ, সম্মান–মোটকথা যা কিছু তার কাছে খোদার পথে উৎসর্গ করা এবং পৃথিবী ও এর সমস্ত কিছুকে তার সেবকে পরিণত করা। "

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬৪)

তিনি আরও বলেন, " সাহাবাদের জীবন দেখা উচিত। তারা জীবনকে ভালবাসতেন না, সর্বক্ষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতেন। বয়াতের অর্থ হল নিজেকে বিক্রয় করে দেওয়া। মানুষ যখন নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে দেয় তখন সে পৃথিবীকে মাঝখানে কেন টেনে আনে। "

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫০৪)

তিনি আরও বলেন: " সাহাবাগণের সম্পর্কও এই পৃথিবীর সঙ্গে ছিল। তাদের ধন–সম্পদ ছিল, চাষাবাদ ছিল। কিন্তু তাদের জীবনে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হল যে, তারা সকলে সহসাই সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَنُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَ
مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

অর্থাৎ আমাদের সমস্ত কিছুই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে। যদি আমাদের মধ্যে এমন ধরণের মানুষ সৃষ্টি হয়ে যায় তবে এর থেকে সম্মানীয় ঐশী বরকত আর কি–ই বা হতে পারে!"

(আল–হাকাম, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪)

এর পর হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) রচিত একটি নযম পরিবেশিত হয়। নযমের পর সৈয়্যদ হাসানাত আহমদ সাহেব (ওয়াকফে নও খাদেম) ' ওয়াকফে নওদের দায়িত্বাবলী' বিষয়ের উপর বক্তৃতা রাখেন।

ওয়াকফীনে নওদের দায়িত্বাবলী

প্রিয় হুযুর! আজ এই ক্লাসে খলীফার সেবক এমন সব ওয়াকফীনে নওরা আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছে যারা পনের বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর ওয়াকফের নবীকরণ করে পড়াশোনা শেষ করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করার জন্য পেশ করে এই অঙ্গীকার করছে যে, প্রিয় হুযুর আমাদেরকে যেখানেই খিদমত করার সুযোগ দিন না কেন সেটিকে আমরা নিজেদের সৌভাগ্য মনে করব। হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করব যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই ত্যাগ স্বীকারকে নিজ কৃপা গুণে গ্রহণীয়তার মযার্দা দিন এবং আমাদের গ্রহণযোগ্য খিদমত করার তৌফিক দান করুন।

প্রিয় ওয়াকফীনে নও ভাইয়েরা! এটি পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে,পিতা–মাতারা তাহরীকে ওয়াকফে নওয়ের সূচনাপর্বেই আমাদেরকে এই আশিসপূর্ণ তাহরীকের জন্য উপস্থাপন করেছেন এবং আমাদের শিক্ষা–দীক্ষা এমনভাবে করেছেন যে আজ আমরাও নিজেদেরকে ওয়াকফ করার জন্য উপস্থাপন করেছি। আর আমরা কতই না সৌভাগ্যবান যে, যুগ খলীফা আমাদেরকে পদে পদে পরিচালিত করছেন এবং বাস্তবিক খিদমতের জন্য প্রস্তুত করছেন। সৈয়্যদানা ও ইমামানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল–খামেস

" প্রত্যেক ওয়াকফে নও যারা রীতিমত এই স্কীমের অন্তর্গত অর্থাৎ জামাতের স্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করুক বা না করুক, সে অবশ্যই ওয়াকফে যিন্দগী। তার প্রত্যেক কথা ও কর্ম ওয়াকফে যিন্দগীর মান সম্মত হওয়া বাঞ্ছনীয় যার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাকওয়া। এ বিষয়টিকে সর্বাগ্রে রাখুন যে, আপনাদেরকে তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করতে হবে। ..... বিশেষ করে এই সমাজে যেখানে স্বাধীনতার রমরমা চলছে এবং স্বাধীনতার নামে নৈতিক অবক্ষয় সর্বত্র চোখে পড়ছে। এক্ষেত্রে আমাদের নিজেদেরকে প্রত্যেকটি দিক থেকে নিরাপদ রাখতে হবে এবং একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে যাতে অন্যান্য যুবক ও কিশোররাও আমাদেরকে দেখে নমুনা নেয়। এবং এইভাবে আমাদের আহমদী কিশোর ও যুবকদের জন্য নমুনা হয়ে তাদের সংশোধনের কারণ হয়। অতএব এই কথাটি স্মরণ রাখুন যে, আপনাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর শিক্ষা ও নির্দেশের আলোকে ইসলামী নমুনা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করতে হবে। আর এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আপনারা সব সময় খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে বিশ্বাস ও অনুরাগের সম্পর্ক রেখে চলবেন এবং যুগ খলীফার প্রত্যেকটি উপদেশকে মান্য করার আপ্রাণ চেষ্টা করবেন। যদি এটি করতে সক্ষম হন তবে আপনারা এই অঙ্গীকার পুরণকারী হবেন যা ওয়াকফে নও হিসেবে খোদা তা'লার সঙ্গে করেছেন বা পিতামাতা আপনাদের জন্মের পূর্বেও ওয়াকফের মাধ্যমে করেছেন। "

(ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ইসমাঈল'–এর সূচনা কালে হুযুর আনোয়ারের বার্তা, ১লা এপ্রিল, ২০১২)

অনুরূপভাবে হুযুর আনোয়ার (আই.) একটি ভাষণে একজন ওয়াকফে নও–এর বৈশিষ্টাবলী বর্ণনা করে আমাদের উদ্দেশ্যে বলেন: প্রত্যেক ওয়াকফে নও–এর নিজেরও দায়িত্ব যে, সে তার দৈনন্দিন জীবন এমনভাবে পরিচালনা করে যেন তা খোদা তা'লার পথে আত্ম–উৎসর্গকারীর (ওয়াকফ) মযার্দা সম্মত হয়। এর জন্য প্রয়োজন, আপনারা চেষ্টা করতে থাকুন যেন খোদা তা'লার নৈকট্যভাজন হতে পারেন এবং প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)–এর প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতির পথে আগুয়ান হন। (ক্রমশ...)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir